Sahitya Akademi 1960

সাহিত্য অকাদেমী

রবীন্দ্র-ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী ১

রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫ বি, কলিকাতা ২৯

৩৪ ক্যাথিড্রেল গার্ডেন রোড, মাদ্রাজ ৩৪

মুদ্রাকর

শ্রীরণজিত কুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস,

১২৩, আচার্য জগদীশ বোস রোড,

কলিকাতা ১৪

গ্রন্থটি ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশ করা হইল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে-সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থ প্রকাশ তাহারই অন্তর্গত।

শঙ্খ ঘোষ

সুহৃদবরেষু

মুখবন্ধ

কবিত্ব ও আমিত্বের সম্বন্ধ কী? *কবির নাম ও সর্বনাম* বইটাতে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল আমি ও অন্য আমির দ্বৈতলীলার চঞ্চলতায়। সেই প্রসঙ্গে আমরা অনেক চিন্তার সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে, গদ্যে ও পদ্যে। এখন আবার সেই একই আলোচনার সূত্রে, তাঁরই কিছু গান আমাদের এই প্রবন্ধটির বিষয়।

আমি ও তার অপর এখানে সাক্ষাৎ জড় প্রকৃতির মুখোমুখি। প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা চপলতা ও নিষ্প্রাণ নির্বিকার বিপরীতের দ্বন্দ্ব। সে বৈপরীত্যে প্রকৃতি তার দৈশিক বর্ণনার মাত্রা ছাপিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কালিকতায়। একদিকে তা অনুকীর্তিত হয় স্মৃতিতে যা সেদিনের অতীতকে বিশ্বদোলায় বসিয়ে তাল মিলিয়েছে প্রকৃতিরই কোল-ঘেঁষা বর্তমানের ছন্দে। আরেক দিকে তা ব্যাপ্ত হয়েছে নিত্যকালের সেই অবিনশ্বর আদিমতায়, কেবল যারই মাধ্যমে প্রকৃতির পাঞ্চভৌতিক উপস্থিতি মানুষের অনুভবে ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চারিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গান, তার স্বতঃস্ফূর্তিতে, সেই ক্ষণিক অথচ কালজয়ী কালিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই আমাদের আশা যে উপচার, ঐতরিকতা ও উৎক্রান্তি সম্পর্কে *কবির নাম ও সর্বনাম* গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যগুলিকে গীতিকাব্যের উদাহরণে প্রোথিত ও প্রসারিত করতে সাহায্য করবে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি।

এ বইটি লেখার কাজেও নানা দিক থেকেই আমাকে শঙ্খ ঘোষের পরামর্শের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রখর সাহিত্য-বুদ্ধি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় অকুণ্ঠভাবেই আমার সহায় হয়েছেন। আমি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক বসন্তের গান

সহৃদয়তার দায়

পাঠক হিসেবে আমাদের কথাবার্তায় সহৃদয়তাকে প্রতিদিনই দেখা যায় তার সহজ সাজে আটপৌরে তিনটি শব্দে—'আমার ভালো লাগে'। যতই সংক্ষিপ্ত ও সরল হোক না কেন এই স্বীকৃতিতে কোনো ফাঁকি নেই। বরং সহজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় এই যে সংবেদনের সূচনা তা যেন ঐ উচ্চারণে কল্পনা ও ধারণার ঘাটগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেদনার আবৃত্তিকে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে দেয় আবার এই বলে—'আমার ভালো লাগে'। চিন্তা বুদ্ধি ও অনুভূতি, যা-কিছু সহৃদয় ভালো-লাগার উপাদান, তা সবই পাওয়া যাবে এই বৃত্তে। অর্থাৎ সাহিত্যে যে-সৃষ্টির বেদনা লেখক থেকে পাঠকে সঞ্চারিত হয় তাকে রসরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি— সহৃদয়তার এই ক্লাসিক সংজ্ঞার সবকিছুই পাঠকের এই অনুভূতিতে বিদ্যমান।

বেদনার একটা দিক জ্ঞানের, আর একদিক ভাবের। যে ধাতু দিয়ে শব্দটি গড়া তাতে জানার দিকটা স্পষ্টই চোখে পড়ে— যেমন বেদ, বিদ্যা ইত্যাদি পদে। অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রের আলোকে অপর দিকটাও বিশদ হয় : সুখাদিভ্যঃ কর্তৃবেদনায়াম্ (৩/১/১৮)—সুখাদি শব্দে যখন কর্তার বেদনা বোঝায় তখনই ক্যঙ্ প্রত্যয়টি প্রযোজ্য। বৃত্তিকারের মতে এখানে বেদনা মানে অনুভব (বেদনায়ামনুভবে),

এবং অনুভব দ্বাদশ প্রকার, যথা— সুখ, দুঃখ, তৃপ্ত, গহন, কৃচ্ছ্র , অস্, অলীক, প্রতীপ, করুণ, কৃপণ, সোঢ় ও অলীক। অতএব, পাঠকের যে-বেদনাকে আমরা ভালো-লাগার সুখ বলে চিনি তা এই পাণিনীয় সূত্র অনুযায়ীও পাঠকর্তার সহৃদয়তা বলে গণ্য হতে পারে।

যদি আপত্তি ওঠে এই বলে যে এত প্রাচীন এই সব রসতত্ত্ব আধুনিক যুগে অচল ও অবান্তর, তাহলে প্রতিবাদীকে আধুনিকতার ইতিহাসটা আবার খুলে দেখতে অনুরোধ করি। কারণ, এমনকি কান্টীয় দর্শনে আধুনিকতার যুগোপযোগী সমালোচনা (Kritik) যেখানে, তার তৃতীয় পর্বে, রুচির বিচার প্রসঙ্গে সুপরিণত বলে প্রসিদ্ধ, সেখানেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাশ্চাত্য চিন্তার তুঙ্গে, দেড় হাজার বছরের পুরনো এই ভারতীয় তত্ত্বের সাদৃশ্য নির্ভুল চোখে পড়ে।

কান্ট বলছেন যে রুচির তৃপ্তি বা অতৃপ্তি কখনোই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নয়। বরং জানা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার সঙ্গে রুচির তৃপ্তিজাত সুখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (দ্রষ্টব্য : ক্রিটিক অব জাজ্মেন্ট, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)—ভারতীয় চিন্তা অনুযায়ী বিদ্যা যেমন বেদনার সঙ্গে। আবার, তাঁরই মতে রুচির তৃপ্তিতে সুখের (বা অতৃপ্তিতে দুঃখের), অর্থাৎ ভালো (বা মন্দ) লাগার কারণ রুচির ধারণায় খোঁজা বৃথা, খুঁজতে হবে ধারণাটি কীভাবে অনুকীর্তিত হচ্ছে এবং অন্তরে সেই অনুকীর্তন কী সাড়া জাগায় তারই মধ্যে (ক্রিটিক অব জাজ্মেন্ট, ১ম অধ্যায়)—এক কথায়, বেদনাক্ত পাঠকের অনুভবে, যা নিয়ে ভারতীয় ব্যাকরণের আলোচনা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই চিন্তা-নায়কের ঐকমত্য থেকেই বোঝা যায় জানা ও নিজেকে-জানার সম্ভাবনায় সহৃদয়তা কত

উর্বর। এই প্রসঙ্গে নৈতিকতার দাবি যদি আদৌ কিছু থাকে তা কেবল এই যে চেষ্টার অভাবে সে সম্ভাবনা যেন ব্যর্থ না হয়; পাঠক যেন প্রাথমিক ভালো-লাগার আরাম ছেড়ে জিজ্ঞাসার পথে পা ফেলতে কুণ্ঠিত না হন। কারণ সেই যাত্রাই সহৃদয়তার দায়। কাব্যজিজ্ঞাসায় ভালো-লাগা তখনই সার্থক যখন তা যাত্রারম্ভের সংকেতরূপে ঐ দায়িত্ববোধকে সজাগ করে, প্রস্তুত করে।

আমরাও রবীন্দ্রনাথের একটি গীতিকবিতা পড়ার পরিশ্রমে সেই সংকেতে সাড়া দিতে চাই। কবিতাটি আমাদের ভালো লাগে, প্রশ্ন জাগায়, এবং প্রশ্ন থেকে প্রশ্নান্তরে এগোবার প্ররোচনা দেয়। এরকম পথচলার বিপদ অনেক জানি। তবু আশা করি কবিতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসার বশে আমরা এ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি তা লক্ষ করে এগোলে দিক ভুল হবার আশঙ্কা কম হতে পারে।

এক বসন্তের গান

১৯৩৯ সালের বসন্তকাল। কবির জীবনে তখন আর দুটি মাত্র বসন্ত বাকি আছে। তবু অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বেশ ফুল ফুটেছিল সেই ঋতুতে। ফাল্গুন মাসে এগারোটা গান লিখলেন। তার মধ্যে পাঁচটা বর্ণে গন্ধে নানান রকমের হলেও মনে হয় এক বৃন্তে ধরা— বিরহ ও স্মৃতির আভাস সব ক'টিতেই।[১] তুলনায় চৈত্রের ফসল শুধু একটি। একটি হলেও একলা নয়, কারণ ফাল্গুনের সব বেদনাই যেন নির্বাসিত হয়েছে বসন্তের এই শেষ গানে। গানটি বহুবিশ্রুত। শান্তিদেব ঘোষ বা সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে শুনে থাকলে তা আর ভুলবার নয়।

১. গান : # ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৭৩৯

তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গান সম্পর্কে বলেছেন, 'সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।'[২] সেই আশ্বাসেই গানটি—এবং আরো কিছু গান—এই প্রবন্ধে কবিতা বলে পড়া হবে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪ : গান* (#১৭৪০) থেকে উদ্ধৃত করছি।

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান।
বিগত বসন্তের অশোক রক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা।

ওগো বিদেশিনী,
তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,
ও যে তোমারি চেনা।
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার রাতের তারা,
তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে।

অধরা ও ধরা, দূর ও নিকট, অতীত ও বর্তমান—এই তিন জোড়া বিপরীতের খেলায় কবিতাটির শুরু। যে-অধরা ধরা পড়লো সে না কি একটা পাখি। অথচ ঠিক তার আগেই মাধুরী নামক এক বিমূর্ত ভাবনার বিশেষণরূপে অধরার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। বস্তুত, সেই বিমূর্তই প্রথম যুগ্মকের ছন্দোবদ্ধ মূর্তিমান পাখি।

দূরদেশের পাখি—সেখানকার আকাশ, তার রাতের তারা সে চেনে। সেখানে ভোর হয় তারই রাতজাগা গান দিয়ে। কত আকাশ,

২. গান : 'গানখণ্ড সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য', পৃ. ১০

কত সকাল-সন্ধ্যা পেরিয়ে সেই সুদূরের প্রতিনিধি উড়ে এসেছে তারই দেশে যার ডানা নাই, যে স্থান। দ্বিতীয় যুগ্মকে শূন্যচারী উদাসীনতা বাঁধা পড়লো আরেক দেশের শব্দ ও সুরের অন্তরঙ্গতায়, দূরত্ব বাঁধা পড়লো নৈকট্যে।

কিন্তু দূরত্ব কেবল দৈশিক নয় এখানে, পাখিটা দূরকালের দূতও বটে : 'বিগত বসন্তের' রং তার পাখায়, 'ঝরা ফুলের গন্ধ' তার বুকে। অর্থাৎ যে-অধরার পায়ে এখন ছন্দের বেড়ি তা আরেক দেশ থেকে এসেছে অতীতের বার্তা নিয়ে স্মৃতিজর্জর বর্তমানে। তাই পাখিটির মধ্যস্থতায়, তৃতীয় যুগ্মকে, অতীত ও বর্তমানের বৈষম্য সমাহিত হলো স্মৃতিতেই—দেশকালের অক্ষকোণে।

প্রবাসী পাখি, অধরা—তাকে ছন্দ দিয়ে বাঁধতে হয়েছে। কিন্তু গানটির উদ্দিষ্টা যে বিদেশিনী সে তাকে চেনে, তার নাম ধরে ডাকে, কাঁকন বাজিয়ে নাচায় যেমন নাচাতো আরো দূর অতীতে আরেক বিরহীর কল্পসঙ্গিনী তার পোষা ময়ূরটিকে। এই ভাবেই শেষ স্তবকে 'অধরা মাধুরী' ও 'বিদেশিনী'কে নিয়ে স্মৃতি ও বেদনার মধ্যে বিনিময়ের পারস্পরিকতা রচিত হয়েছে।

কবিতাটি আমাদের ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে তা হয়তো এই পাঠ থেকেই খানিকটা অনুমান করা যাবে। একদিকে বৈপরীত্যের সজ্জা, আরেক দিকে বিদেশিনীর উপস্থিতি—দুইয়ের সমাহারে যে রস ও রহস্যের পাক, তাকেই আকর্ষণের কারণ মনে হতে পারে। বিশেষ করে, বিদেশিনীর প্রতিমাটি কৌতূহল জাগায়। সে কৌতূহলকে মানসিক বিকার বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। আমাদের জিজ্ঞাসায় তা খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা সাহিত্য ও অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ কী তাই এখানে অনুসন্ধানের বিষয়।

অবশ্য আলোচ্য কবিতাটি থেকে সেই সম্বন্ধ নির্ণয়ের কাজে সরাসরি কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীতিতে অভিজ্ঞতার সূচনা তার রেশমাত্র নেই এখানে। প্রায় সবটাই বিমূর্ত ধারণা আর কল্পনায় আঁকা ভাবচ্ছবি। কেবল 'বিদেশিনী' কথাটিই তার ব্যতিক্রম। অতএব আমাদের মূল জিজ্ঞাসার সূত্রেই এখন খুঁটিয়ে দেখা দরকার কে এই বিদেশিনী।

বিদেশিনীর কুলুজি

প্রশ্নটা যে অবান্তর নয়, বরং রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাসে তার গুরুত্ব যে যথেষ্টই, তা স্পষ্ট জানা যায় *জীবনস্মৃতি* থেকে। সংগীতে কথা ও সুরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় কবি লিখেছেন :

> বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!' সেই গানের ওই একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে, আজও ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ওই গানের ওই পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।'
>
> ⟨র ১০ : ৯৫⟩

যে-গানের সুরে ও কথায় বিদেশিনী তাঁর কাব্যে সুপরিচিতা নায়িকার প্রসিদ্ধি অর্জন করে, কবি তার উৎস খুঁজে পেয়েছেন প্রায় শৈশব-ছোঁয়া বাল্যে। গানটি লিখেছিলেন ১৮৯৫ সালে চৌত্রিশ বছর বয়সে, আর এই আত্মকথা লিখছেন পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়সে ১৯১১-১২ সালে। ঠিক কবে যে পুরনো গানটি শুনেছিলেন, এতকালের ব্যবধানে তা আর মনে নেই। কিন্তু সন-তারিখের দাগ না

থাকলেও, তাঁর কবিত্বের ইতিহাসে অভিজ্ঞতার এই সাক্ষ্যকে প্রাথমিক তথ্য বলেই গণ্য করতে হয়।

কারণ নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে যে ভাবচিত্রটি এক কবি-কল্পনা থেকে অনুজ আরেক কবি-কল্পনার উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে স্মৃতির মাধ্যমে। কী করে তা সম্ভব হলো? কালভেদে ব্যক্তিভেদে ছবিটি কি কিছুমাত্র বদলায়নি? মূল গীতের রস ও আস্বাদ কি অক্ষুণ্ণ আছে? বিবর্তনের চাকাটা কি একবার ঘুরেই থেমে গেল, না কি আরও চলবে? এসব কথা যথাসময়ে যথাস্থানে তলিয়ে ভাবা যাবে। আপাতত দেখা যাক ১৮৯৫-এর কুলুজিটার জন্য আরও কিছু তথ্য জোগাড় করা যায় কিনা।

কাজটা কবি নিজেই শুরু করেছিলেন *জীবনস্মৃতি*-তে নিজেরই কৌতূহলে। তবে সে গ্রন্থে সংকলিত তথ্যের খনি বাল্যস্মৃতিতে যেখানে চেতন ও অবচেতনের মধ্যে যাতায়াতের পথে কোনো শরিকি চৌকাঠে হোঁচট খাবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় তিন দশক পরে লেখা *ছেলেবেলা* গ্রন্থের ভূমিকায় সে অবস্থাটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি।' মানবশিশুর সহজাত প্রতিভা তখনও প্রধানত ইন্দ্রিয়নির্ভর; প্রতীয়মানতার গণ্ডি মেনে নিয়েই অভিজ্ঞতা সংসারের মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। বাইরে জীবনযাত্রার খাস সড়কে নেমে পা চালাতে গেলে যে ধারণাদৃঢ় প্রত্যয় দরকার তা এখনো তার অনায়ত্ত।

অবশ্য বাল্য এসে কৈশোরে পৌঁছবেই, আর তখন থেকেই দেখা যাবে 'কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক ও অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে।'

বয়ঃপ্রাপ্তির সেই ইতিহাস থেকে নেওয়া একটি কাহিনীতে, *ছেলেবেলা*-র পৃষ্ঠায়, আবার 'বিদেশিনী'র সাক্ষাৎ মেলে।

১৮৭৮ সাল, কবির বয়স তখন সতেরো। কথা হচ্ছে বিলেত যাবেন ব্যারিস্টারি পড়তে। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে তার আগেই ভাইটিকে ইংরেজি আদব-কায়দায় দীক্ষিত করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে বম্বে (মুম্বাই) শহরে দাদার এক মারাঠি বন্ধুর বাড়িতে কয়েক মাসের জন্য রবীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা হলো। পরিবারটি আলোকপ্রাপ্ত, ধর্মমতে স্থানীয় 'প্রার্থনা সমাজ'এর ব্রাহ্ম, চালচলনে সাহেবি ধরণের আধুনিক। সেই বাড়ির এক মেয়ে 'ঝকঝকে করে মেজে এসেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে'—সেই রকম মেয়ে 'বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে।' 〈র ১০ : ১৬০〉 তাঁরই কাছে বিলিতিয়ানার শিক্ষানবিশি করার কথা কিশোর কবির। কিন্তু শেষ জীবনের স্মৃতিতে সেই ক'মাসের অভিজ্ঞতায় শিক্ষার চেয়ে সখ্যের দিকটাই বড়ো দেখায়।[১]

কৈশোরের স্বল্পায়ু বন্ধুত্বের এই রকম টুকরো টুকরো খবর অনেকই পাওয়া যায় তাঁর পরিণত বয়সের লেখায়। তাদেরই মতো এই স্মৃতিও বৈকালিক বিষণ্ণতায় ভরা। তবুও, বহু পুরাতন অতীত থেকে থেকে এসে ভুলে-যাওয়া এক দম্‌কা শোক যে-ভাবে এই কাহিনীকে নাড়া দিয়ে যায় শেষ কয় লাইনে, তা পাঠককেও অভিভূত করে। মেয়েটির অকালমৃত্যুর কথা মনে রেখে মুম্বাই-প্রবাসের ষাট বছর পরে জ্ঞানবৃদ্ধ কবিত্বের করুণা ও কল্পনায় আঁকা সে-ভাবচ্ছবি এই আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষ কালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।
>
> 〈র ১০ : ১৬১〉

আমরা জানি যে অতি-বাল্যাবস্থায় কোনো এক গানের সুরে ও কথায় কবি তাঁর নিজের 'আমি চিনি গো চিনি' গানটির উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, প্রায়-শৈশবে শোনা ও ভরা যৌবনে লেখা— এই দুই অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধে 'বিদেশিনী' নাম্নী যে উদ্দিষ্টা, সে-ই যেন আবার 'বিদেশী পাখি' হয়ে ফিরে এসেছে তৃতীয় আরেক অভিজ্ঞতার বর্ণনায়। ১৯১২ সালের ঐ গানের কুলুজিতে বাল্য ও যৌবনের মাঝামাঝি যে ফাঁকটা ছিল তা *ছেলেবেলা* থেকে উদ্ধৃত এই তথ্য দিয়ে ভরানো সম্ভব।

অবশ্য, উদ্ধৃতিটার ভাবে ও ভাষায় যে-জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহেই ত্রিকালপক্ব চিন্তার ফসল। সতেরো বছরের অভিজ্ঞতায় তা অনায়ত্ত। তবে একথাও মনে রাখতে হয় যে *ভানুসিংহের পদাবলী*-তে লেখকের অসামান্যতা ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে এবং চন্দ্রনাথ বসুর মতো বিচক্ষণ সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করেছে[১]; দান্তে পেত্রার্ক গ্যেটের সৃষ্টি থেকে তাঁর উদীয়মান প্রতিভা চিন্তা ও কল্পনার খোরাক জোগাড় করতে শিখেছে; কিছুটা কাঁচা হাতে

হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন 'ভারতী' পত্রিকায়।

অতএব, উল্লিখিত অনুচ্ছেদের মূলগত ধারণাগুলি যে এই কিশোরের অনধিগম্য তা ভাববার, এমনকি অনুমানেরও কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। হতে পারে যে শেষ দুটি বাক্যের প্রান্তিক অনুভব এখনো তাঁর অস্তিত্বের মজ্জাগত নয়। কিন্তু 'বিদেশী', 'অচেনা মহল', 'দূরের বন', 'হৃদয়ের দখল' ইত্যাদি পদে, যথাক্রমে অপরত্ব, পরিচিতি, নৈকট্য এবং অন্তরঙ্গতার দ্যোতনা যে তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনার নাগালের বাইরে তা বিশ্বাস করা শক্ত। কারণ প্রাথমিক শৈশব-চেতনার বাইরে সংসারের পথে পা ফেলেছে বলেই অভিজ্ঞতা এখন আর নিছক ইন্দ্রিয়ের শাসনে অন্তরীণ নয়; কল্পনা ও ধারণার দ্বারা সে নিজেকে শিক্ষিত করে নিচ্ছে। এক কথায়, দেখা যাচ্ছে যে অতিদূর আদিম বাল্যস্মৃতিও পরিণত যৌবনের কবিত্বে সৃষ্টির উপাদান বলে গ্রাহ্য হয়েছে কবি ও তাঁর পাঠকদের বিচারে।

অতএব প্রস্তুতিপর্বের সে-ইতিহাস থেকে আরো কাছের, আরো আত্মসচেতন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্ন অভিজ্ঞতা বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। বস্তুত প্রাক্-ইতিহাস বা পূর্ব-ইতিহাস কিংবা সন্ধিলগ্ন বলেই তা উল্লেখ করতে হয়। কেননা প্রাক্, পূর্ব, সন্ধি ইত্যাদি পদে তাদের অপরটি অপেক্ষিত, উদ্দেশ্য যেমন হয় বিধেয়ে। এই সাপেক্ষ-সম্বন্ধেই আমরা বিদেশিনী ও বিরহিণীর পারস্পরিকতা বিচার করেছি। কিন্তু তাতে কি 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে' সম্পর্কে জিজ্ঞাস্যের উত্তর পাওয়া যায়?

সত্যিই যায় না। কেননা এই চারটি শব্দের বাগ্‌বন্ধ আমরা যে তাদের নিজ নিজ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থবৃত্তের বাইরে একমাত্র সাপেক্ষ-

সম্বন্ধেই জানতে পেরেছি, সে তো কেবল তাত্ত্বিক জানা। সেই জানাটাই আমরা আলোচ্য গানটির দৃষ্টান্তে বিশেষ করে বুঝতে চাই। কারণ কুলুজিটার সাহায্যে যে বিদেশিনীকে তার পূর্ব-পরিচয়ে জানা যায় সে কাব্যরূপিণী নয়, সে এখনও নিতান্তই প্রত্যক্ষ দেখা ও শোনার বিষয়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান, কিন্তু তার স্থান কবিত্বের প্রাক্-ইতিহাসে। সুতরাং সে অভিজ্ঞতা কীভাবে অনুকীর্তিত হচ্ছে তা-ই এখন আমাদের বোঝা দরকার।

স্মৃতি ও ধ্বনি

কুলুজির কাল

গানটির প্রাক্-ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য থেকে মনে করার কারণ নেই যে তার কুলুজিটা কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত নিরেট তথ্যে ঠাসা ফিরিস্তি মাত্র। কেননা কুলুজি তৈরি হয় কালিক অনুক্রমে অতীতকে স্মৃতির সূত্রে সাজিয়ে। সে-সজ্জায় এলোমেলো অসংবদ্ধ তো কিছু নেই-ই, বরং তা খুব হিসেবি সতর্ক নির্বাচকেরই দৃষ্টান্ত। কোন্ তথ্যটা গৃহীত হবে বা না হবে তা ঠিক হয় স্মৃতি-বিস্মৃতির সম্বন্ধে, তাদের পারস্পরিকতায়। বিস্মৃতিই স্মৃতির দোসর হয়ে অতীত থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতাকে সাজায় বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ বা বিষয় অনুযায়ী। ঠিক যেমন ঐতিহাসিক আখ্যানে, তথ্যনিষ্ঠা যদি তথ্যদাসত্বে পরিণত না হয়ে থাকে, অতীতের অনুকীর্তন করা হয় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে বা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আখ্যায়কের বিচারবুদ্ধি অনুসারে নির্বাচিত ঘটনাবলী দিয়ে। এজন্যেই জার্মান ও ফরাসী জাতীয়তাবাদ নিয়ে লিখতে গিয়ে ফ্রিডরিশ নিচে ও এর্নস্ট

রেনাঁর মতো উনিশ শতকীয় চিন্তা-নায়করা বিস্মৃতিকেই স্মৃতির কর্ণধার বলে ভাবতেন।

বিস্মৃতি কীভাবে তার বাছাই-করা বিষয়ে স্মৃতিকে সাজায় তার নমুনা বলে যদি ১৯৩৯ সালের বসন্তকালীন গানগুলিকে পড়া হয় তাহলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে সেই গীতিগুচ্ছকে খুব সযত্নে একত্র করা হয়েছে বিদেশিনী-বিরহিণীর প্রাসঙ্গিক বৃন্তে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, শেষ জীবনে, *প্রান্তিক*-এর পরবর্তী রচনাগুলিতে স্মৃতির প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে যতই বেড়েছে ততই যেন তার বিষয় নির্বাচকের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বিস্মৃতিতে।

বিস্মৃতির যে দুটি লক্ষণে নির্বাচকের এই ভূমিকা চোখে পড়ার মতো তার একটিকে বলা যায় ঐতিহাসিক, আর অন্যটিকে আস্তিত্বিক। ঐতিহাসিক এই অর্থে যে তা অপেক্ষাকৃত দূর অতীতকে—বয়োবৃদ্ধ কবির শৈশবকে—তার প্রসঙ্গ বলে' বেছে নিয়েছে। আর আস্তিত্বিক এই অর্থে যে অব্যবহিত বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই এখানে অপেক্ষাকৃত নৈকট্যে নির্বাচিত হয়েছে স্মৃতির প্রধান বিষয়রূপে। এই লক্ষণ দুটির অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রথমটিতে ধ্বনি ও দ্বিতীয়টিতে বিদেশিনী-বিরহিণীর শব্দ ছবিতে।

শব্দছবি-কথাটা পাঠককে মনে করিয়ে দেবে যে স্মৃতি-বিস্মৃতির এই সহযোগিতা ঘটে কালিক ব্যবধানের নিয়মে। পাঠকের পক্ষে তা জানা সম্ভব কেবল ভাষায় তার দাগ ধরে ধরে, কেননা তা 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা/বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।' *আকাশ-প্রদীপ*-এর 'ভূমিকা'য় এই সত্যটা রবীন্দ্রনাথ আস্তিত্বিক অর্থে 'বাঁচা-মরার খেলা' বলে বর্ণনা করছেন। নিজের আয়ুর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, মৃত্যু আসন্ন জেনেই হয়তো 'জীবনের

এ ছেলেমানুষি' তাঁর কাছে 'মরণেরে বঞ্চিবার ভান' বলে মনে হয়। তাই কবিতায় স্মৃতির অনুকীর্তনে তিনি দেখেছেন ছায়া-দিয়ে-গড়া 'আপন দ্বিতীয় রূপ' যা কার্যত নশ্বরতা ও কালিকতার সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছে, কারণ 'কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে।'

যে সব শব্দছবি দিয়ে স্মৃতি-বিস্মৃতির এই বাঁচা-মরার খেলা অতীতকে কবিতার সামগ্রী করে তুলেছে সেগুলি একাধারেই দেখা ও শোনার বিষয়। শিলাইদহ পর্বের গদ্যে, বিশেষ করে *ছিন্নপত্রাবলী*-তে, দেখার ওপরেই জোর পড়েছে বেশি, যদিও প্রায়শই দেখার টানে শোনাও এসে গেছে, এবং মাঝে মাঝে এই উভয়সম্বন্ধ উৎক্রান্ত হয়েছে অভিজ্ঞতার সীমানা পেরিয়ে অজানা অচেনা অনির্দেশ্যতায়।

কিন্তু শেষ পর্বের পদ্যে, গানে ও কবিতায়, শোনারই প্রাধান্য—কারণ 'সবার প্রথম ধ্বনি'। ('জল' : র ৩ : ৬৪২) ধ্বনির উপচারে কবি তাঁর অস্তিত্বের উপমা খুঁজে পেয়েছেন : 'জলে আর তীরে/আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।/ আঁকড়িয়া সাঁতারের ঘড়া/অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে/অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে।' (র ৩ : ৬৪৩) ছেলেবেলায় বাড়ির পুকুরে সাঁতার শেখা একই সঙ্গে বন্ধন ও মোচনের অভিজ্ঞতা :

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোবা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়;
তার পরে দেখিলাম, এ পুকুর এও বাতায়ন—
এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।

(র ৩ : ৬৪৪)

অতীতটা ছেলেবেলার এবং তা অনির্দেশ্যের কোণ-ছোঁওয়া সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। আস্তিত্বিক দূরত্বের মাপকাঠি হিসেবে কালিকতার এ-বর্ণনায় শৈশব ও অনির্দেশ্যতার মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধের ধারণাটা শেষ দুবছরের কবিতায় ধ্বনির তাৎপর্য কী তা বিশদ করে দেখায়। একদিকে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত জরাগ্রস্ত কবির চোখে তাঁর শৈশবের দূরত্ব, আর অপরদিকে পুকুরের তট আর জল ঠেলে ঠেলে সাঁতার কাটার স্বাধীনতা— এ দুইয়ের দূরত্ব ('...তটে-বাঁধা জলে/গভীরের বক্ষতলে/লভিয়াছি প্রতিক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়' ⟨র ৩ : ৬৪৪⟩)।

উভয়তই দূরত্বটা কালিক। কিন্তু ছেলেবেলার অতীতটা দূর এজন্যেই যে মরণাপন্ন বৃদ্ধের চোখে তা নির্ভুল ভাবেই পৃথক। সে পার্থক্য চেনা যায় তথ্যসীমা দিয়ে : সুপরিচিত শৈশবের প্রতিটি ঘটনাই তার দূরত্বের মাপ। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, অনির্দেশ্যতার দূরত্বটা জানা সম্ভব কেবল এজন্যেই যে তার তথ্যসীমা থেকে সে উৎক্রান্ত হয়েছে। একদিকে জ্ঞেয় ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েও তা আরেকদিকে পৌঁছে গেছে অনির্দিষ্টের সীমান্তে। আস্তিত্বিক দূরত্বও তার ফলে অনির্দেশ্যতায় আক্রান্ত। স্মৃতি-বিস্মৃতির জীবন-মরণ খেলার মতোই এখন তা দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধে পর্যবসিত।

'প্রথম যুগের সেই ধ্বনি'

১৯৩৮ থেকে কবির শেষ লেখাগুলিকে কালানুক্রমে পড়লে দেখা যায় যে তখন থেকে ধ্বনিই তাঁর রচনায় অনির্দেশ্যের বাহন ও প্রতীক বলে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই, একটির পর একটি কবিতায়। আর সর্বত্রই তথ্যসীমা দিয়ে নির্দিষ্ট শৈশব-স্মৃতিতে অস্তিত্বের দূরত্ব

সূচিত হয়েছে অনির্দেশ্যতায় তার উৎক্রান্তিতে।

সে দূরত্ব যে সামাজিকও হতে পারে তা বোঝা যায় 'এপারে-ওপারে' কবিতাটির নাম ও বক্তব্য থেকে। 〈র ৩ : ৬৯৭-৬৯৯〉 রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোতে ভিড় বড়ো বেশি ('ওখানে সবাই আছে')। এপারে আখ্যাতা আমি-কবি থাকেন একা-একা। 'জীবনের তথ্য'র চেয়ে 'জীবনের তত্ত্ব' সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ বেশি, তাই 'আপনার উচ্চতট থেকে/নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।' রাস্তার এপারে যখন নিঃশব্দ দুপুর, তখন ওপারে 'অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে'।

প্রায় গোটা কবিতাটিই, তার তিন-চতুর্থাংশ, সেই অনির্দিষ্টের বর্ণনা। সব মিলিয়ে একটা কোলাহল যার কিছুটা সমবেত, আর কিছুটা নামগোত্রহীন বাসিন্দাদের চরিত্রচিত্রণ যা নাগরিক জীবনে দারিদ্র্য, দায়িত্বহীনতা, সাংস্কৃতিক শালীনতার অভাব ইত্যাদির সাক্ষ্য। আখ্যাতা অবশ্য জানেন যে ওপারের 'ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা' আসলে প্রাণেরই প্রবাহ। যে অনির্দিষ্ট ধ্বনি তাঁর কবিতায় তিরস্কৃত তা একই 'মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল' যা 'ছন্দটারে তার/বদল করিছে বারংবার।' তাঁর মনও সেই 'সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি' ব্যগ্র হয়ে ওঠে, যদিও তা নীচের তলার মাটিতে পা ফেলতে পারছে না এখনও।

অথচ অনির্দিষ্ট যে শুধু এপার-ওপারের সামাজিকতায় নির্দিষ্ট নয়, তা বোঝা যায় প্রায় একই সময়ে ১৯৩৮-৩৯-এ পাশাপাশি লেখা দুটি কবিতায়—'ইস্‌টেশন' 〈র ৩ : ৭০১-৭০৩〉 আর 'সাড়ে নটা' 〈র ৩ : ৭০৪-৭০৫〉। আস্তিত্বিক দূরত্ব এখনও ইস্টেশনে 'ওরা', 'ওদের' সর্বনামে চিহ্নিত, কেননা যাত্রীদের হট্টগোল, আর তার ওপরে রেলগাড়ির দিনরাত গড়্ গড়্, ঘড়্ ঘড়্ আছেই। কিন্তু সব মিলিয়ে

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যেকার তফাৎটাই এখন বড়ো কথা। 'গাড়ি-ভরা মানুষের ছোটে ঝড়' 〈র ৩ : ৭০১〉 অবশ্যই, কিন্তু তাদের যে গাড়ি ধরা, গাড়ি ফেল করা ইত্যাদি তা এখন সেই সাধারণ চলচ্ছবি যা 'নিত্য-খেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—/কেবল যাওয়া-আসা'। 〈র ৩ : ৭০১〉 ভিড় জমে ঠিকই, কিন্তু তা স্থায়ী নয়। নিতান্তই 'চলাফেরার ধারা'। একদিক থেকে আসে, আবার বিপরীত স্রোতে ভেসে যায়।

কবিত্ব এখন আর উদাসীনতায় আড়ষ্ট নয়, সামাজিক বিকার নিয়ে বিব্রত নয়। এখন তা সংসারের চলতি ছবি দেখা নিয়েই ব্যস্ত, তার বর্ণনাই কবির দায়িত্ব : 'দুবেলা সেই এ সংসারের/চলতি ছবি দেখা,/এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার/ইস্টেশনে একা।' 〈র ৩ : ৭০২-৭০৩〉 এই একাকিত্ব নির্লিপ্ত নয় মোটেই, বরং তা 'সময়-সূত্র-ছাড়া' অনির্দেশ্যকেই খুঁজছে 'দেহহীন পরিবেশহীন' অরূপে 〈র ৩ : ৭০৪〉 যার ফলে কবিতার 'বাণীমূর্তি সেও একা'। 〈র ৩ : ৭০৫〉

অনির্দেশ্যের দিকে কবিত্বের এই ঝোঁকটা অনৈতিহাসিক দার্শনিকতায় পর্যবসিত হতো যদি রবীন্দ্রনাথ সত্যিই পৃথিবীর কবি না হতেন। কিন্তু তিনি সচেতনভাবেই এমন সব শব্দছবি ব্যবহার করেছেন যে এই উৎক্রান্তির ধারণায় অপার্থিবের কোনো প্রশ্রয় নেই। যে-দুটি কথা তিনি এই প্রসঙ্গে শেষ পর্বের কবিতায় বারবার ব্যবহার করেছেন তা নিতান্তই পার্থিব—'ঘণ্টা' আর 'ছবি'। ইস্টেশনে ঘণ্টা বাজলেই বিদায়ের ক্ষণ এসে যায়, এবং সব কিছুই যে একটা বিশ্বব্যাপী চলাচলের ইতিহাস তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে যাত্রী 'মুখ রাখে জানালায়, বাড়িয়ে/নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে।' 〈র ৩ : ৭০২〉

এই ছাড়িয়ে-যাওয়াটা যে কেবল রেলগাড়ির শিস দিয়েই নিয়ন্ত্রিত নয় যখন 'দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে', 〈র ৩ : ৭৩৭〉 তা বোঝা

যায় যদি মনে রাখি যে ঐ দুপুরেই সানাইতে সারঙের তানে বিদায়ের পাশাপাশি 'নিবিড় ঐক্যমন্ত্র' বাজছে, বাজছে 'তারি স্পর্শ লেগে' বৈকালিকী সাহানা যার সুরে-তালে 'প্রথম যুগের সেই ধ্বনি/ শিরায় শিরায় উঠে রণরণি' ⟨র ৩ : ৭৩৭-৭৩৮⟩, এবং প্রাত্যহিকের বাধা ডিঙিয়ে 'ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়' ধীরে ধীরে খুলে যায়, মন ফিরে যায় 'অলক্ষ্যের তীরে'। ⟨*সানাই* : 'সানাই'; র ৩ : ৭৩৬-৭৩৮⟩

'বিশ্বের মূল উৎস' থেকে ওঠা সেই প্রথম যুগের ধ্বনিই কবি আবার শুনবেন *আরোগ্য*-এ যখন 'ঘণ্টা বাজে দূরে' এবং এমন কিছু ছবি তাঁর চোখে পড়বে 'জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর' ⟨র ৩ : ৮১৭⟩, যখন *জন্মদিনে* সংকলনে কালিম্পঙের পাহাড় আর আকাশের নীলিমায় তিনি শুনতে পান 'অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে/অনাহত সুরে/প্রভাতে শোনাব, ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ' ⟨র ৩ : ৮৫০⟩।

ঐ সংকলনেই (*জন্মদিনে* #২০) ভাষা ও ধ্বনির সাংবিধানিক সম্বন্ধ উল্লেখ করে অনির্দেশ্যতায় কবিতার উৎক্রান্তিকে তিনি 'ব্যাকরণদুর্গে বন্দী' শব্দের বিদ্রোহ বলেই বর্ণনা করেছেন : 'যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি/ছাড়া পেল আজি,/দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্ধ রহি/অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী' ⟨র ৩ : ৮৫৫⟩। সেই জরুরি অবস্থায় কবিতার কাজ যে বিদ্রোহের দামামায়, উৎক্রান্তিতে, তার স্বর মেলানো তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কেননা এ বিদ্রোহে গর্জন থাকলেও হিংস্রতা নেই, 'শুধু ধ্বনি' তার ভঙ্গি। তাই,

মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে। ⟨র ৩ : ৮৫৬-৮৫৭⟩

ধ্বনি আর ছবি

ধ্বনির পাশাপাশি ছবিও যে অনির্দেশ্যতার ধারক ও বাহক তা আগেই বলা হয়েছে। ইস্টেশনটা তাই 'সংসারের চলতি ছবি' বলে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছিল, যেন তা ছবির পরে ছবি— 'চিত্রকরের বিশ্বভুবন খানি'-রই এক টুকরো যা আঁকড়ে ধরার জিনিস নয়, দেখার জিনিস : 'কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—/আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,/ দেখার জিনিস এটা।' 〈র ৩ : ৭০২〉

দেখার জিনিস হিসেবেই তা ধ্বনিতে সাড়া দেয় এবং অকারণেই স্মৃতি-বিস্মৃতির গহনে এতকালের হারিয়ে যাওয়া ছবিগুলিকে আবার মনশ্চক্ষুর গোচর করে তোলে। মৃত্যুর দেড় বছর আগে *আরোগ্য*-তে 〈#৪; র ৩ : ৮১৭-৮১৯〉 পরপর এরকম তিনটি ছবিতে অতীতের স্মৃতিসজ্জা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বিশেষ করে কবি নিজেই যখন তার সঙ্গে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যৎকে যুক্ত করেন দূরাগত ঘণ্টারবের সংকেতে : 'এই সব উপেক্ষিত ছবি/ জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা/দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।' 〈র ৩ : ৮১৯〉

প্রথম ছবিটা শিলাইদহ পর্বের, যেন সরাসরি তুলে আনা হয়েছে *ছিন্নপত্রাবলী*-র অ্যালবাম থেকে—গ্রাম্য পথ, ছোটো নদী, হাট, গঞ্জ, পাড়ার কুকুর, চাষীর বলদ ও মহিষ, ধানখেত, বন ও মন্দির। পল্লীচিত্র, যা মনে আসে রেলগাড়ির আওয়াজে যখন 'মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি/.../ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে।' 〈র ৩ : ৮১৮〉

দ্বিতীয় ছবিটাও নদীতীরের, তবে নদীটা পদ্মা নয়, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা, সময়টা দিন নয় রাত্রি। ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ একটি গানের

শব্দে : 'শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে/উঠিছে গানের ধ্বনি তরঙ্গ কণ্ঠের/ ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।' ‹র ৩ : ৮১৮› এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, কিন্তু সে রাত্রিতে তার যে-শিহরন ঘুমন্ত মনটাকে জাগিয়ে তুলেছিল তা এখনও বৃদ্ধ কবির স্মৃতিকে আন্দোলিত করে।

তৃতীয় ছবিটাও গঙ্গার, তবে পশ্চিমের গঙ্গা। শহরতলীতে গার্হস্থ্য দৃশ্য। নদীটায় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে-চর পড়েছে সেখানে খেতের ফসল ধান নয়, বাজরা আর তরমুজ; গোরু-মোষ নয়, কৃষকের পোষ্য জীব ছাগল; ভরা নদীর খেয়া নয়, মরা নদীতে গুণটানা একসার মাল্লা। তবে এখানেও ছবিটা ধ্বনির হাত-ধরা : রেলগাড়ির শিস বা মাঝির গানের আকস্মিকতা নেই, কিন্তু ইঁদারা থেকে জল টানার নালায় সারাদিন কুলকুল শব্দ এবং দুপুর বেলা কাজের মেয়ে ভজিয়ার একটানা গুনগুনানি সুর দেখা ও শোনার সহযোগিতা সম্পর্কে স্মৃতিকে সজাগ করে রাখে।

ধ্বনি ও ছবির এই যুগলবন্দী অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কবিতায় একেবারে নবাগত কিছু নয়। মৃত্যুর আসন্নতায় তার অনুভূতি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রখর হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু জীবনদর্শনের উপাদান হিসেবে ধারণাটা যে অনেক আগেই তাঁর রচনায় প্রবিষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ ৬৬ বছর বয়সে ১৯২৭ সালে লেখা 'সকরুণ বেণু' গানটা থেকে ‹গান : ৫৭৮-৫৭৯›—

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা সাগরবেলার অধীর বায়ে
বনের ছায়ে।
তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।

তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়মাঝে
শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।
ছবি মনে আসে আলোতে ও গীতে—যেন জনহীন নদীপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে
বনের ছায়ে।
তাহারি আভাস লাগিল গায়ে।

রবীন্দ্রনাথ সেবার জাভা ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ব্যাংকক হয়ে ফিরবেন বলে পিনাঙ যাত্রা করেন। তখন স্টিমারে বসে গানটা রচনা করেন ২রা অক্টোবর। তাই তা প্রবাসে লেখা ঠিকই, কিন্তু বিজন কিনা সন্দেহ। কারণ ঐ তারিখেই অমিয় চক্রবর্তীর কাছে ব্যস্ত ঊর্ধ্বশ্বাস চিঠিতে তাঁর নালিশ খুবই স্পষ্ট : 'এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে *ঠেসে* দেওয়া হয়েছে। ... সমুদ্রে জল সর্বত্রই, কিন্তু একফোঁটা জল নেই যে পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই।' ‹র ১০ : ৬৬৬›

তবে সময় থাক আর নাই থাক, তারই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। পথে কোনো নৌকা বা অন্য কোনো জলযান থেকে একটা বাঁশির সুর অকস্মাৎ তাঁর, শ্রোতার মনে প্রতিভাষী একটা সুর জাগিয়ে দিল—'তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।' যা তাঁকে স্পর্শ করেছে তা সুর, কথা নয়। কথা হলে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে অপরিচিত বিদেশীর কৌতূহল হয়তো অর্থের পাঁচিলেই *ঠেকে* যেত, কেননা *জীবনস্মৃতি*-র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধে' যেমন বলা হয়েছে, 'বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।' ‹র ১০ : ৯৪›

এখানেও সুরে সুরে বিনিময় সম্ভব হয়েছে অনির্বচনীয়ের জন্যেই। বাঁশি শুনে যে 'রাগিণী লাগিল গায়ে' তার বলার কথা কিছু

নেই, তা কেবল 'সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার অজানা বেদনা'ই বহন করতে পারে। স্পষ্টতই ধ্বনির প্রভাবে শ্রোতা অভিহিতের সীমা পেরিয়ে অজানা অনির্দেশ্যের এলাকায় এসে পড়েছেন। তাই স্মৃতির টানে ধ্বনি থেকে ছবিতে উত্তরণ—'ছবি মনে পড়ে'। ছবিটা স্মৃতি বা স্মৃতির মুদ্রা নয়। কোনো বিরহী হৃদয়ের সংবাদ নিয়ে আসেনি সে। সে বেদনার দূত। স্মৃতির মধ্যে অভিজ্ঞতার তথ্য কোথাও পৌঁছে দেওয়া যদি তার দায়িত্ব হতো, তা হলে কথা দিয়ে সে কাজ সারা যেত।

কিন্তু স্মৃতি নয়, স্মৃতি-রেশ অনির্বচনীয় বলেই তা এক অনুভূতি থেকে আরেক অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয় বেদনার দ্বারা। তাই স্মৃতি-রেশের (Erinnerungsspur, Erinnerungsrest) ধারণাটির জনক স্বয়ং ফ্রয়েড তাঁর সমস্ত রচনায় তাকে মনঃসমীক্ষণের যে-দিকটা শুধু প্রয়োগসিদ্ধির ওপর নির্ভর করে, তার আওতার বাইরে রেখেছেন। সাধারণত এই রেশগুলি বিস্মৃতিতেই নিহিত থাকে, তবে ঘটনাপ্রসঙ্গে তা কখনো কখনো সজ্ঞানে স্মৃতিগোচর হয়। সেই প্রসঙ্গেই ধ্বনির প্ররোচনায় ছবি তৈরি হয় স্মৃতিতেও—'ছবি মনে পড়ে'। ছবিটা তাই চোখে দেখার জিনিস নয়, মনশ্চক্ষুতে দেখার বিষয়! অর্থাৎ যা ছিল সংসারযাত্রায় প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বহির্গত উপাদান তা এখন পুরোপুরিই ছবির মতন দেখাচ্ছে কর্তার অন্তরে।

মনশ্চক্ষু আর তাতে দেখা ছবি বলতে মোটামুটি বোঝা যায় যে রূপায়ণের কথা হচ্ছে। কিন্তু রূপায়িত হবার দরকার কী ছিল তা না জানা থাকলে কথাটা পরিষ্কার হয় না। সে কথা ভেবেই দার্শনিক লুডভিগ ভিট্‌গেনস্টাইন ছবির ধারণা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বলেন যে অনেক সময় যা চাই তা হাতের কাছে না পেলে তার প্রতিভূ

হিসেবে আমরা সে ব্যক্তি বা বস্তুর বিগ্রহ তৈরি করে নিই। বিগ্রহটা ছবিও হতে পারে, কিংবা তার পরিবর্ত এমন কিছু হতে পারে যা ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ করার কাজ করে। প্রতিভূটা কাছে থাকলে আমরা ঝুঁকে পড়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, আমাদের স্নেহের দাবি মেটাই সেই দেখায়। মনশ্চক্ষুতে যে ছবিটা দেখা যায় তাও তেমনই বাসনার ঝোঁক মেটাবার চেষ্টা। বাইরে টাঙানো একটা ছবির দিকে এই অবস্থায় শরীরের যে ভঙ্গি, স্মৃতির গ্যালারিতে ছবি দেখাও তেমনি অন্তরের বিশেষ এক ভঙ্গি।[১]

স্মৃতি ও বাসনা

স্মৃতি ও বাসনার সম্বন্ধ ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে স্বীকৃত হয়েছে অন্তত চতুর্থ খৃষ্টাব্দের পাতঞ্জল যোগদর্শনের যুগ থেকে। দেড় হাজার বছর পরে ভিট্‌গেনস্টাইনের বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল অনেক দিক থেকেই লক্ষ করা যায়; উভয়তই মূল প্রশ্নগুলি অনেকটা এক ধরণের এবং সিদ্ধান্তও একই। তবে একটা বড়ো তফাৎ এই যে ভিট্‌গেনস্টাইন তা ভেবেছেন চোখে-দেখা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, আর সাংখ্যযোগে জোর পড়েছে কালিকতায়। পাশ্চাত্য বিচারে কালিকতা যে বাদ পড়েছে তা নয়। যে-ঝোঁক বা ভঙ্গির কথা সেখানে বলা হয়েছে তা কার্যত অনুকীর্তনেরই বিষয় : অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের বেশে সাজিয়ে নতুন করে বলার বিষয়।

যোগদর্শনে অনুকীর্তনটা আরো সরাসরি এসে গেছে কার্যকারণের অনুবাদে :

> বাসনার ফল স্মৃতি। যে বাসনারূপ উৎপাদক কারণকে আশ্রয় করিয়া তৎফল যে ধর্মাধর্ম বা সুখ-দুঃখরূপ ভাব তাহার উৎপত্তি বা স্মরণ হয়, তাহাই বাসনার স্মৃতিরূপ ফল। স্মৃতির যে উদ্ভব হয়, তাহা সৎ বা অবস্থিত বস্তু হইতেই হয়, কারণ, অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ স্মৃতি হইলেই তদাকারা বাসনা আহিত ছিল বুঝিতে হইবে। এইরূপে স্মৃতিরূপ ফল হইতে বাসনার সংগ্রহ বা সঞ্চিতভাবে অবস্থান ঘটে।
>
> (ফলং বাসনানাং স্মৃতিঃ। যং বাসনাস্মৃতিরূপং প্রত্যুৎপাদকম্ আশ্রিত্য যস্য ধর্মাদেঃ প্রত্যুৎপন্নতা—বর্তমানতা, স্মৃতিরূপং তৎ ফলং বাসনানাম্। স্মৃত্যুদ্ভবস্তু সত এব ব্যক্ততা নাসত উপজনঃ। এবং স্মৃতিরূপফলাদ্ বাসনাসংগ্রহঃ।)
>
> *পাতঞ্জল যোগদর্শন* : ৪/১১[১]

বাসনার আঁকশি-টানে স্মৃতি কেমন করে এসে পড়ে, বাংলা সাহিত্য থেকে তার দুটি উদাহরণ ধরে বিষয়টার আলোচনা করা যাক। উভয়তই ছবিটা আঁকশির কাজ করে। প্রথমেই বিদ্যাসাগরের *সীতার বনবাস*। যে-অতীত বাসনায় সঞ্চিত ছিল তা-ই এ গ্রন্থে বর্তমান হয়ে ছবিরূপে প্রত্যুৎপন্ন হয়েছে আলেখ্য-দর্শনে অভিভূত রাম ও সীতার স্মৃতিতে।[২]

আলেখ্য-দর্শন

আলেখ্য ১।। রাম-সীতার বিবাহের দিন। জনক রাজা কন্যাদান করছে। ছবি দেখে সীতা বলে উঠল : চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি (অম্মো জাণামি তস্‌সিং জেব্ব পদেসে জেব্ব কালে বত্তামি)। শুনিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, ... যেন সেই সময় বর্তমান রহিয়াছে (সময়ঃ স বর্তত ইব)।

আলেখ্য ২।। চিত্রকূটের পথে কালিন্দী নদীর পারে একটা বড়ো বটগাছ দেখে— সীতা বলিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা মনে হয়? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া, আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলে। সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, ... আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন (সীতা—সুমরদি বা এদং পদেসং অজ্জউত্তো। রামঃ — অয়ি কথং বিস্মর্যতে। অলস লুলিতমুগ্ধান্যধ্বসম্পাতখেদাদ্/... দুর্বলানি অঙ্গকানি/ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা। সীতা— ...পেক্‌খামি দাব অজ্‌জউত্তসহত্তধরি-দতালবত্তাদবত্তনিবারিদাদপংঅত্তণো ...)।

‹মন্তব্য।। বিদ্যাসাগরের বাংলা এভাবে মূলপাঠের সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় যে বাসনা ও স্মৃতির সম্বন্ধ খানিকটা বিকৃত হয়েছে অনুবাদে। রাম যে কেবল হাতপাখার বাতাসে ও ছায়ায় সীতাকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, তা

নয়। যুবক রামের উক্তিতে তার বাসনার শারীরিক দিকটা—তার যৌনতা—খুবই স্পষ্ট। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির নৈতিকতা ও রুচির প্রভাবে, তৎকালীন গ্লোবায়নের ধাক্কায়, বাসনা ভারতীয় দর্শনের তাত্ত্বিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেন ভিক্টোরীয় আধুনিকতার আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।)

আলেখ্য ৩।। লক্ষ্মণ ছবিতে 'জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি' দেখালো, আর মনশ্ছবিতে তারই অনুকীর্তনে সীতাকে সম্বোধন করে রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয় এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটিরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া, আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরী তীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল গন্ধবহের সেবন করিতাম।

এই ভাবানুবাদে মূলপাঠ থেকে খুব বেশি সরে আসেনি। কিন্তু তারপরেই 'কিং চ' বলে রামের যে উক্তি তার পরিবর্তে বাংলায় লেখা হয়েছে, 'তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।' রাম কিন্তু বলেছিল—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসক্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥

(ছায়ার্থে— পরস্পরের প্রতি আসক্তিবশত আমরা অবিরল জল্পনায় ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে গালে গাল ঠেকিয়ে বাহুতে বাহু জড়িয়ে এমনই রাত কাটিয়ে দিতাম যে রাত্রিই যেন জানতো না কখন তা ফুরিয়ে গেছে।)

〈মন্তব্য॥ শৃঙ্গারসুখের এ বর্ণনা যদি বাসনা ও স্মৃতির আলোচনায় অপাংক্তেয় হয় তাহলে সংগতভাবেই মনে করা যায় যে যোগদর্শনের মূল ধারণাটি পাশ্চাত্য প্রভাবে খর্বীকৃত হয়েছে।〉

আলেখ্য ৪॥ লক্ষ্মণ তারপর ছবির যে অংশে পঞ্চবটী আর শূর্পণখাকে দেখাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে—মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া, ম্লান বদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য। চিত্রদর্শনে চিরাতীত জন্মস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। (সীতা—হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণম্। রামঃ —অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে চিত্রমেতৎ। সীতা—জহা তহা হোদু। দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই। রামঃ— হন্ত বর্তমান ইব মে জনস্থানবৃত্তান্তঃ প্রতিভাতি।)

〈মন্তব্য॥ বিদ্যাসাগরের অনুবাদ এখানে মূলপাঠেরই অনুগামী। তবে, রামের দ্বিতীয় উক্তিটা লক্ষ্মণের মুখে বসানো হয়েছে। আমাদের আলোচনায় সে বিচ্যুতি অপ্রাসঙ্গিক। স্মৃতিফলটা সটান বর্তমানে এসে গেছে বাসনার আকর্ষণে রাম ও সীতা দুজনেরই কথায়।〉

আলেখ্য ৫॥ সীতার প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ মাল্যবান পাহাড় দেখিয়ে কিছু বলছিল; রাম তাকে থামিয়ে দিল। কেননা,— শুনিয়া, পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া, আমার শোকসাগর অনিবার্য বেগে, উথলিয়া উঠিতেছে;

জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। (রামঃ—বিরম বিরমাতঃপরং ন ক্ষমোঽস্মি প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকী বিপ্রয়োগঃ।)

〈মন্তব্য॥ এখানেও মূলপাঠের সঙ্গে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই, যদিও রামের সিধে কথা, 'আমি আর সইতে পারছি না' একটু পল্লবিত হয়েছে অনুবাদে। আসল কথা, স্মৃতি ও বাসনার যে সম্বন্ধ তা সম্পূর্ণই স্বীকৃত।〉

স্বপ্নে আমার মনে হল

বাংলা সাহিত্য থেকে যে দ্বিতীয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয় তা রবীন্দ্রনাথের গান—

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়।
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লীঝংকারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে।
পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে। (গান : ৭৩২)

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, যা স্মৃতি-বাসনার কাঠামোয় লেখা। কেননা, যে-পথিক রাতদুপুরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে সে যে বাসনার বিষয় তা নিঃসন্দেহেই অনুমান করা যায়। জাগ্রত অভিজ্ঞতার অতীত থেকে সে সুপ্তির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

তবে অচেতন মনে তার যে স্মৃতি-রেশ ছিল তা বিস্মৃতি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এখন সজাগ অবস্থায় রিমিঝিমি ধ্বনিতে অনুকীর্তিত হচ্ছে। অচেতন থেকে সচেতনে বাসনা ও স্মৃতির এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবটাই ঘটছে মনে-মনে, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত যোগদর্শনের মতে। কেননা, অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষই স্মৃতি (অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। ১/১১)

অসম্প্রমোষ শব্দে বোঝাচ্ছে সেই অবস্থা যখন কর্তা বলতে পারে আমার অনুভূতি আমারই, পরস্ব কিছু নেই এতে। সে অবস্থাই স্মৃতি; কেননা আমার যা মনে পড়ে তা আমি ছাড়া অন্য কারও হওয়া সম্ভব নয়। এদিক থেকে স্মৃতিকে অন্তর্মুখিতার পরাকাষ্ঠা বলা যায়। কিন্তু তার মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে। স্মৃতি দুই রকমের : উল্লিখিত সূত্রটির ভাষ্যে তাদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে ভাবিতস্মর্তব্যা এবং অভাবিতস্মর্তব্যা বলে। স্বপ্নাবস্থায় তা ভাবিতস্মর্তব্যা, জাগরণে অভাবিতস্মর্তব্যা। (সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্তব্যা চ অভাবিতস্মর্তব্যা চ। স্বপ্নে ভাবিতস্মর্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে ত্বভাবিতস্মর্তব্যেতি।)

'ভাবিত' পদে এই প্রভেদের কালিক চরিত্রের ওপর জোর পড়েছে। 'হাওয়া' যখন বর্তমানে উপস্থিত হয়, তখনই তা ভাবিত। বর্তমান তো সর্বদাই হচ্ছে। অনবরত, নিরবচ্ছিন্নভাবে তা ধারাবাহিক। যা হবার তা একের পর এক অবিরল উপস্থিত হচ্ছে স্বতই, সেই ধারাস্রোত বজায় রাখার জন্য তার নিজের গতিবেগ ছাড়া কোনো চেষ্টার দরকার নেই। স্বপ্ন সেই বিশুদ্ধ হওয়ারই নিদর্শন। কেননা অতীত অভিজ্ঞতাকে তখন কেবল বর্তমান রূপেই দেখা যায়। বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে অতীতকে বর্তমানের মনে-পড়ায় টেনে আনার যে পরিশ্রম জাগ্রত অবস্থায় অপরিহার্য, স্বপ্ন-দর্শনে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

স্বপ্ন আমরা দেখি। চোখ বুঁজে ঘুমোচ্ছি, তবু দেখি। কারণ, চোখটা মনশ্চক্ষু। স্মৃতির নিরাবিল অন্তর্মুখিতাই তার কাজের প্রশস্ত সময়। কিন্তু, কী দেখি আমরা? যখন বলি মনে পড়ে তখন 'চিত্ত কি পূর্বানুভবরূপ প্রত্যয়কে স্মরণ করে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে?' (কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি আহোস্বিদ্ বিষয়স্যেতি।) প্রশ্নটা তুলে ভাষ্যকার নিজেই উত্তর দিচ্ছেন বুদ্ধি আর স্মৃতির মধ্যে পার্থক্যের দাগ কেটে—বুদ্ধি গ্রহণাকারপূর্বা এবং স্মৃতি গ্রাহ্যাকারপূর্বা। (তত্র গ্রহণাকারপূর্বা বুদ্ধির্গ্রাহ্যাকারপূর্বা স্মৃতিঃ)।

গ্রহণ ও গ্রাহ্য সব অনুভবেই থাকে। স্মৃতির অনুভবে যা জানা তা এমনই বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে যা পূর্বানুভূত কিন্তু এতকাল অনধিগম্য ছিল, যা জেনে এখন বর্তমানে আমরা বলতে পারি জানছি বা জানলুম। সেই বিষয়টি গ্রহণ করাই বুদ্ধি। আবার স্মরণ-জ্ঞান এমনও হতে পারে যার নূতনত্ব এই নয় যে পূর্বানুভূত বিষয়টা জেনে ফেলেছে। জানতে পারছি বা জানতে পারলুম—এই জ্ঞানই সেই অনুভবে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা, স্মৃতিগ্রাহ্য নতুন একরকম জানা। অধিগত বিষয়ে আকারিত বলেই স্মৃতি গ্রাহ্যাকারা। এজন্যেই যোগাভ্যাসে স্মৃতিই প্রধান সাধন বলে বিবেচিত হয় (শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতি-সমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্ ১/২০)। টীকা : 'অনুভূত ধ্যেয়ভাবের পুনঃপুনঃ যথাবৎ অনুভব করিতে থাকা এবং তাহা যে অনুভব করিতেছি ও করিব তাহাই অনুভব করিতে থাকার নাম স্মৃতিসাধন। স্মৃতি সাধিত হইলে স্মৃত্যুপস্থান হয়। স্মৃতি একাগ্রভূমির একমাত্র সাধন।'

স্মৃতিজ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের সঙ্গে বিজড়িত বলেই যোগীরা স্বপ্নজ্ঞান ও নিদ্রাজ্ঞানের দ্বারা চিত্তে স্থিতিভাব আয়ত্ত করার চেষ্টা করে

(স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ১/৩৮)। টীকা : 'স্মরণ অভ্যাস করিলে স্বপ্নকালেও 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ স্মরণ হয়।'

যোগাভ্যাস হোক বা না হোক আত্যন্তিক অন্তর্মুখিতার বশে কবিকেও কখনো কখনো লিখতে হয়, 'স্বপ্নে যেন মনে হলো'। বাসনায় ভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় স্মৃতির দ্বারা গৃহীত হয়ে স্বপ্নলব্ধ ঘটনার অনুকীর্তন করছে নতুন এক জানার ইতিকথায়। বর্তমানের ওপর অবিশ্রান্ত বর্তমানের ভাসান ভাবিতের কালিন্দীতে। হওয়ার এই স্রোতোধারায় কোনো বাঁধ নেই বাধা নেই, কিন্তু বাঁক আছে। বাসনার মূল্যায়ন বদলে যাচ্ছে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে। কৈশোর-যৌবনের যে-অতীত একদা ছিল নিত্য নূতন হওয়ার বিষয়, তা কোথায় তলিয়ে গেছে। সব অতীত এখন দানা বাঁধছে বিরহ ও মৃত্যু, অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছেদে নতুন অক্ষকোণে, নতুন কাহিনী লেখা হচ্ছে কবিতায় ও গানে। এক ফালগুণ-চৈত্রের গীতিগুচ্ছে তারই কাহিনী এখন আমাদের আলোচনার বিষয়। 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে' গানটি সেই গুচ্ছের বৃন্তস্বরূপ (গান : ৭২৭), তাই অধরাকে ধরাই আমাদের জিজ্ঞাসার কেন্দ্রীয় সমস্যা।

অধরাকে ধরা

পনেরো বছর আগেকার এক বসন্তেও অধরাকে ধরার কথা শোনা যায়। (গান : ৫০৮) সে অধরা তখন 'কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,' যদিও ইঙ্গিতে জানিয়ে যায় যে ভেতরে বাইরে, প্রকৃতির উচ্ছ্বাসে এবং বিচ্ছেদ-চেতনার রিক্ততায় সে সর্বত্র উপস্থিত। তখনও সে পলাতক। তবে বছর দেড়েক বাদে (কার্তিক ১৩৩২) সে ধরা দেয়

গানেই, ছন্দের বন্ধন মেনে নিয়ে 'সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।' (গান : ৫৩১)

কিন্তু কতকাল সে কেবল বর্ণনার বিষয় হয়ে থাকবে। অন্তিম পর্বের চিন্তায় তা এতই গুরুত্ব পাবে যে তারই প্রস্তুতি হিসেবে যেন *শেষ সপ্তক*-এর একটি কবিতায় (#১৩ 'রাস্তায় চলতে চলতে') তার ধারণাটা স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা হয়েছে। পথে যেতে যেতে শোনা গেল বাউলের গান, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়'। গৃহবধূর কাছে কিছু ভিক্ষা পেল। বাউল গাইল অচিন পাখির গান, কবি দেখলো জানলায় এলোচুলে এক নারীমূর্তি আর সেই সঙ্গে দেখলো অধরাকে তার চোখের চাওয়ায়, তার কাঁকন-পরা নিটোল হাতে। পাখি ও নারী—একটির ওপর আরেকটি আরোপিত হলো। বাউল তা জানলো না, কবি নিজেই এই ছবিটা তৈরি করে নিল।

প্রথম দুই স্তবকে এই দেখা ও শোনার পরে বাউলের বাদ্যযন্ত্র আর পাখির খাঁচার তাৎপর্য কী তাই বলা হচ্ছে কবিতাটির বাকি দুই স্তবকে।

(ক) একতারা।। অধরা আকারিত হয়েছে নারীমূর্তিতে—'তুমি রাগিণীর মতো আস যাও/একতারার তারে তারে।/সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা।' কিন্তু একবার সুর বেজে উঠলে তারটা আর চোখে পড়ে না, সুরের কাঁপন থেকে অচিন বেরিয়ে আসে। যেমন, পিকাসোর ছবি (১৯০৩) 'বৃদ্ধ গীটারবাদক' : যান্ত্রিক চেহারাটা আছে ঠিকই, কিন্তু বাঁদিকের মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে তা উৎক্রান্ত হয়েছে তৃতীয় আরেক রাশিতে।

(খ) খাঁচা।। অচিন পাখি, সেই অধরা, বন্দী থাকে দৈনন্দিন সংসারজীবনে মিলনের অভ্যাসে ('মিলনের খাঁচায় থাক, নানা সাজের খাঁচা')। তবু সেখানেও নিত্য বিরহের স্থান থাকে 'পাখির

পাখায়,/স্থকিত ওড়ার মধ্যে।' দিগন্ত পেরিয়ে সেই বিরহ উৎক্রান্ত হয় 'সকল দৃশ্যের বিলীনতায়'। এই হলো অধরা যা একতারাও নয় নারীমূর্তিও নয়, যা আসলে বাসনায় উৎক্রান্ত বিরহের ধারণা।

কবিতা যখন বাসনায় স্বপ্নস্বরূপিণী হয়ে ওঠে যার 'অভিসারের পথে পথে/স্মৃতির দীপ জ্বালা' (গান : ৭২৫), তখনই 'শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,/অধরাকে ধরা।' ছন্দই সেই শৃঙ্খল। কথাটা বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কবিজীবনের শেষ দুই বছরে *আরোগ্য* ও *জন্মদিনে* সংকলনে।

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচর মনের গহনে। (র ৩ : ৮৩২)

অগোচর মনের গহনে, বিস্মৃতির অবচেতনে, 'আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়'। সে ভাষার অর্থ নেই। নিজেকে সে প্রকাশ করতে জানে না। প্রকাশের বাধায় প্রতিহত হয়ে তার গতিভঙ্গে 'অধরার প্রতিবিম্ব' জেগে ওঠে ছন্দের তরঙ্গদোলায়। (গান : ৮৪৪) সেই টুকরোগুলি জড়ো করে 'অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল' সূত্রে গাঁথা কবিতায় 'শিল্পের রচনা'ই ছন্দোজাল, ছন্দের বাঁধন যাতে অধরা ধরা পড়ে। (র ৩ : ৮৫৬)

বিদেশিনী-বিরহিণী

আমাদের এই পাঠে অধরা মাধুরী ও তাকে ছন্দোবন্ধনে ধরার ধারণাটা শুদ্ধরূপে দেখা গেল বটে। কিন্তু আলোচ্য গানটির উদ্দিষ্টা বিদেশিনীর সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ তা এখনও তেমন পরিষ্কার নয়। বিদেশিনী বললে

সাধারণত এমনই কোনো ব্যক্তি বোঝায় যার নামে বিশেষ একটা দেশ ও কালের, বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার ছাপ থাকবেই। সেই অভিজ্ঞতার পরিসরে, তার মাপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী, কথাটি দামিনী বা বিমলা বা সুচরিতার মতো ব্যক্তি-নামেরই কাজ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিদেশিনী বিশেষ কোনো স্থান কাল বা কাহিনীতে অর্গলিত নয়।

কুলুজিতে তাকে আমরা নানা বিশেষে দেখেছি। দেখেছি বিদেশিনী এক নয় অনেক, আর শেষ পর্যন্ত তা এই গানে পরিণত হয়েছে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বে বর্ণিত কোলাজ্-এর মতো কতকগুলি ভাবচ্ছবির অধ্যায়ে (Überdeterminierung; overdetermination)। এদিক থেকে সে এক ধরণের কল্পকথা বা মিথ্-এর নায়িকা যে অভিজ্ঞতায় উদ্ভূত হয়েও রূপকথার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বিদেশিনী তাঁর কবিতাসুন্দরী বা মানসসুন্দরীর থেকে অভিন্ন।

এরকম রূপকথা কবি আরো রচনা করেছেন 'সুরের গুরু', 'পথিক' ইত্যাদি কল্পচিত্রে। চিত্রগুলি তিনি একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেননি, নানাভাবে নানান দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা বসিয়েছেন একাধিক কবিতায়। চিত্রকরদের মধ্যে দেখা যায় অনেকেই একই জিনিস বারবার এঁকেছেন। একই স্টুডিও বা একটিই নারীমূর্তি, একই ফসল-কাটা মাঠ বা শালুকফোটা পুকুর—উদাহরণের অন্ত নেই। অথচ কোনো বড়ো শিল্পীর কাজেই এই অভ্যাসকে ক্লান্তিকর নিছক পুনরাবৃত্তি মনে হয় না। মোটিফ্ একই, কিন্তু প্রত্যেকটি ক্যানভাসে তার চিত্ররূপ স্বতন্ত্র। 'অধরা মাধুরী' গানেও বিদেশিনী প্রাক্তন ভাবচ্ছবিগুলি থেকে সরে এসে রূপায়িত হয়েছে তার স্বাতন্ত্র্যে।

চিরবিরহ

সে এখন স্বতন্ত্র, প্রথমত, তার কালিকতায়। তার নামটা স্বভাবতই ভাবা হয় দৈশিক অনুষঙ্গে। কিন্তু দেশকে কখনো কাল বাদ দিয়ে ধারণায় আনা যায় না, বিশেষ করে যখন বিচ্ছেদ বা বিরহের কথা প্রায়শই জড়িত থাকে বিদেশিনীর স্মৃতিতে। এ গানেও সে বিরহিণী। কিন্তু সাধারণ অর্থে বিরহিণী নয়, চিরবিরহিণী। এই তার কালিক বৈশিষ্ট্য।

এই গানটির পঁচিশ বছর আগে এক আনুষ্ঠানিক ভাষণে 'চির' শব্দে গভীর আস্তিত্বিক তাৎপর্য আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, অনন্ত প্রেমকে সার্থক করছে।' 〈*শান্তিনিকেতন*। র ১২ : ৪৫৬〉 সেই চেষ্টার উদাহরণে বাউলের 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি' ও বৈরাগীর 'মনের মানুষ কে রে!/আমি কোথায় পাব তারে!' উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

> 'মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে— ... যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে, 'আমি কোথায় পাব তারে?' সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। ... কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে : যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।'
>
> 〈র ১২ : ৪৬৩-৬৪〉

এই সন্ধান প্রকৃতপক্ষে আত্মানুসন্ধান, 'অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি' করা। সেই আপন বা আমি-ই মনের মানুষ। তাকে জানার চেষ্টায় বিরাম নেই, ছেদ নেই, কারণ তার উৎস বাসনায়। সেই উৎস যদি আলস্যে বা অনাদরে শুকিয়ে যায় তাহলে বাসনাই পঙ্গু হয়ে পড়বে চালিকা শক্তির অভাবে। আলোচ্য গানটির উদ্দিষ্টা যে-বিদেশিনী সে মূর্তিমতী বাসনা। সে-ই মনের মানুষ যাকে নিরন্তর জানতে চাওয়ার প্রয়াসে স্মৃতি ও বাসনার কথা বারবার এসে গেছে অন্ত্যপর্বের কবিতায়। কবির আমি, তাঁর মনের মানুষ আর বিদেশিনীর সমাহারে নির্মিত ভাবচ্ছবিটা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কেবল এজন্যেই যে বিরহের ধারণা এখন খোলনলচে বদলে রূপান্তরিত হয়েছে চিরবিরহে।

'চিরবিরহ' পদে 'চির' বিরহকে দীর্ঘায়িত করছে এই বোঝাতে যে তা অনন্ত, সাধারণ বিরহের মতো অল্পমেয়াদী বিচ্ছেদ নয়। 'কেননা'. রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস'। বিদ্যাপতির 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া' নিয়ে তাঁর মন্তব্যে কথাটা বিশদ হয়।

হরি ছাড়া আমার দিন কেমন করে কাটবে, রাত কেমন করে কাটবে— এই দুশ্চিন্তা শুধু সেই বিরহীরই যে মিলনের প্রতীক্ষায় আছে। আশা আছে মিলন হবেই। তার বিরহ তাই বিচ্ছেদের নামান্তর মাত্র— মিলন থেকে মিলনে উত্তরণের পথে সাময়িক বিশ্রাম, এপারের সুখ ও ওপারের পূর্ণতার মধ্যবর্তী এইটুকু ব্যবধান যা দিনের অভাববোধ ও রাত্রির অতৃপ্তি দিয়ে স্বচ্ছন্দে ভরিয়ে নেওয়া যাবে। বৃন্দাবন আর রাসের মাঝামাঝি কয়েকটি মাত্র বসন্ত বা শাওন-ভাদরের

ব্যাকুলতায় কাতর এই মাথুরের কাজই হচ্ছে সেই অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য মিলনকে নিকটতর করা।

এক কথায়, এ বিরহ শুধু সেই ক্ষণিক বিরতি যা মিলনাদর্শের প্রতিশ্রুতিকে সিদ্ধিতে পরিণত করারই শর্ত। চিরবিরহীর পক্ষে মিলনের এই নিশ্চয়তায় সান্ত্বনা খোঁজা সম্ভব নয়। তার বিরহ একটা বিশুদ্ধ শূন্যতার নাম, এমনই শূন্যতা যা কোনো পূর্ণতার বৈপরীত্য দিয়ে নির্ধারিত নয়, এমন অভাব যা কোনো পাওয়া দিয়ে মিটিয়ে ফেলার নয়। এই বিরহ নিঃশর্ত, অনাপেক্ষিক।

কোনো কিছুকেই চিরায়ত করার বিপদ এই যে তার ফলে খণ্ড-বিশেষের সময়-চিহ্নগুলি মুছে যায়, যা মূর্ত তা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। হয়তো বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে ঝোঁকের বশে বিদেশিনী-বিরহিণী, স্বপ্নসঙ্গিনী, হয়ে উঠেছে মূর্তিমতী বাসনা, স্মৃতির টানে যে অনুভূতি-গোচর; হয়েছে মনের মানুষ যার সন্ধান শেষ হবার নয়; কিংবা সেই আমি, নিজেকে জানার ইচ্ছা যার কখনোই মিটবে না।

মূর্তিমতী বাসনা, মনের মানুষ আর আত্মজিজ্ঞাসু আমিত্ব—এই তিনটি উপাদান মিলিয়ে যে-ভাবচ্ছবিটা রচিত হয়েছে তাতে অভিজ্ঞতার চেয়ে ধারণার ওপরই জোর পড়েছে বেশি। এমনকি বিদেশিনীর দেশটাও আর বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার বাহন নয় এখন, যেমন ছিল 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটিতে। অবশ্য তার ফলে কবিত্বের কোনো ক্ষতি তো হয়ই নি, বরং আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায়, আমি ও তার অপরের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকারের একাগ্র আলোকে, তখনকার কবিতাগুলির মতো তাঁর গানও প্রখরতায় ও উজ্জ্বলতায় তাঁর নিজেরই রচনার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

মৃত্যু

মৃত্যুর এই আসন্নতাই 'অধরা মাধুরী' গানের বিদেশিনীকে তার অন্যান্য ভাবচ্ছবি থেকে আলাদা করে রেখেছে। কবির অনুভূতি তখন মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন। সে চিন্তা তাঁর কবিতায় নতুন কিছু নয়। প্রসঙ্গটা *সন্ধ্যাসংগীত*-এরই সমসাময়িক, এবং *কড়ি ও কোমল* থেকে শুরু করে, তাঁরই মন্তব্য অনুযায়ী, 'এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ'। ‹র ১ : ১৪৭›

কিন্তু তা সত্ত্বেও *প্রান্তিক*-এর পরবর্তী রচনায় সে উপলব্ধিতে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে তাও অস্বীকার করা যায় না। সে-পর্যায়ের কবিতায় গাঢ়তর হয়ে নতুন মাত্রায় চিত্রিত তা শাদা চোখেই ধরা পড়ে। কিন্তু কেন যে ঠিক তখনই তা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিত্বের অভিব্যক্তিতে, তার কারণ খুঁজতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে অস্তিত্বের সম্বন্ধ নিয়ে ভাবতে হয়।

প্রত্যেকটি মৃত্যুই ব্যক্তিসত্তার চরম নিজস্বতার নিদর্শন, তার হাতের ছাপ যা তার নির্ভুল পরিচয়। তবু সে অনন্যতা সত্ত্বেও মৃত্যু কারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। কেননা অভিজ্ঞতা বলতে বোঝায় অতীতকে জানা; মৃত্যুর ফলে যে সেই অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তার পক্ষে সে অতীতকে জানা সম্ভব নয়। অথচ সে ব্যক্তিও তার জীবদ্দশায়, অন্য সকলের মতোই, মৃত্যু সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিল পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—অপরের মৃত্যু দেখে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টায়।

পরোক্ষ হলেও অপরের মৃত্যুর মাধ্যমে অর্জিত এই জ্ঞান অস্তিত্বের মৌল উপাদানগুলির অন্যতম। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে

সংসার রচনার উপায় সেই জানা। তাই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া থেকে শুরু করে স্মারক-স্তম্ভে ও শিলালিপিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে, ভাষার অগণন উদ্ভাবনায়, সেবা ও যত্ন, শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার অনুষ্ঠানে মৃত্যুশোক সব সমাজেই পারস্পরিকতার দীক্ষা বলে গণ্য হয়ে থাকে। একজনের অভাবে সামাজিকতার ঘনবিন্যস্ত অন্যোন্য-নির্ভর সমগ্র কাঠামোটাই যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যেই মৃত্যুশোকের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাজ ক্ষতিপূরণে তৎপর হয়ে ওঠে।

তবে পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মূল্য যতই হোক, ব্যক্তিগত শোক তাতে লাঘব হয় না। প্রত্যেকটি জীবন যেহেতু অন্যান্য জীবনের সঙ্গে একই সামাজিকতার জালে ঘনিষ্ঠভাবে গাঁথা, একটি মৃত্যুতে তার কাছাকাছি অন্যান্য সত্তাও অভাববোধে পীড়িত হয়। কিন্তু সে অভাববোধেও তারতম্য ঘটা অসম্ভব নয়। এমনকি একজনের জীবনেই দুটি মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া দুরকমের হতে পারে কে তার কত কাছের লোক ছিল সেই অনুপাতে। যেমন, *জীবনস্মৃতি*-তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর মার মৃত্যুসংবাদ তাঁকে তেমন বিচলিত করেনি ('সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না'), কিন্তু দশ বছর পরে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ফলে 'মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়'। 〈র ১০ : ১১৭-১১৮〉

দ্বিতীয় ঘটনাটা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে (২২ জুন, ১৯১৭) সেই অভাববোধের তীব্রতা স্পষ্টতই অপেক্ষাকৃত গভীরতর স্নেহের সম্পর্কে নিহিত—'শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল আমার আকাশ

থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল।' 〈চিঠিপত্র ১১ : ৮〉

কিন্তু অপরের মৃত্যুর মারফৎ পাওয়া এই যে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা তা যতই মূল্যবান হোক, *প্রান্তিক*-এর পরবর্তী কবিতায় মৃত্যুকে জানার সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য আছে। কেননা, ইতিমধ্যে 'মৃত্যুদূত এসেছিল' 〈র ৩ : ৫৪১〉, এবং তার ফলে 'জীবনের দিগন্ত-আকাশে/যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে, দিল ধৌত করি/ ব্যথার দ্রাবক রসে.../ কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে/ উঠে গেল যবনিকা।' 〈র ৩ : ৫৩৫〉 এ-ক'লাইনে পরপর দুটি উপমায় যে-বৈশদ্য ও উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে তা একেবারেই আরেক জাতের পরিবর্তন।

তারই পরিণামে নূতনের এই যে নাটকীয় আবির্ভাব, সে-বিষয়ে হরিহরানন্দ আরণ্য পাতঞ্জল যোগদর্শন প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় যা লিখেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মৃত্যুর আসন্নতায় জ্ঞান নিজেকে বাইরে থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী হয়, এবং 'জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অন্তর বিষয়ালম্বিনী হইলে সেই বিষয়ের অতি স্ফুটজ্ঞান হয়। সুতরাং মরণকালে অন্তর্বিষয় সকলের স্ফুটজ্ঞান হয়।'

দ্বিতীয়ত, এই সময়েই স্মৃতিবাসনার আজীবন সঞ্চয়ও যুগপৎ চিত্তে উদিত হয়, এবং 'প্রধান ও অপ্রধান সংস্কারসকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে'। তবে সব সংস্কার (অর্থাৎ স্মৃতিবাসনা) হঠাৎ একসঙ্গে ভিড় করে আসে বলেই তা 'যেন পিণ্ডীভূত হইয়া যায়'। (আরণ্য, *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, পৃ ৮০৩)

এই বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কেও

প্রযোজ্য। মৃত্যুচেতনার একাগ্রতায় অন্তর্বিষয়ের স্ফুটজ্ঞানে সেগুলি তখন উজ্জ্বল, এবং প্রধানে-অপ্রধানে বাছাই-করা পিণ্ডে-পিণ্ডে সজ্জিত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। সে কথাই যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন *শেষ সপ্তক*-এ কিছু কমবয়েসী প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবিতায়—

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছুডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।

〈র ৩ : ২২১〉

সেই প্রেক্ষিতই এ-জন্মের সমস্তটাকে, অর্থাৎ অতীতকে, পিছু-ডাকা স্মৃতিতে তার সমগ্রতায় সাজিয়েছে *প্রান্তিক* থেকে *শেষলেখা*-য়। অন্তিম পর্বের রচনাগুলিতে পিণ্ডে-পিণ্ডে সাজানো সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় একান্ত আন্তর বিষয়ালম্বী মৃত্যুজ্ঞান কবিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে নিম্নলিখিত কয়েকটি বক্তব্য বা থিম (theme) আশ্রয় করে।

(ক) মৃত্যুদূত—যার আগমনে মৃত্যুর অনিবার্যতা নাতিদূর সম্ভাবনায় জরুরি হয়ে ওঠে 〈র ৩ : ৫৩৫, ৫৪১〉।

(খ) মৃত্যুভয়—যা থেকে পরিণত বয়সে, অন্তত *আত্মপরিচয়*-এ নির্ভীক ঘোষণার পরে ('যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারা জীবনকে চেনে না') তিনি মুক্ত বলেই মনে করেন নিজেকে। তা সত্ত্বেও *প্রান্তিক*-এর পরে, *সেঁজুতি*-তেও স্বীকার করতে হয়, 'মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়' 〈র ৩ : ৫৬১〉। নিজের নির্ভরতা তিনি হারান নি—'আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছে অনুভব/সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব' 〈র ৩ : ৮৩৪〉। তবুও শেষ লেখাটি পর্যন্ত মৃত্যুভয়কে

'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি') বাস্তব জীবনের সত্য বলেই তিনি মেনে নিয়েছেন।

(গ) স্মৃতি—যা স্বপ্নে, বাসনার বশে, অতীতের অনুকীর্তন করে বর্তমানে, এবং মানুষ যখন মৃত্যুর 'অধিকার' থেকে বঞ্চিত হয় : 'পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;/ রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে/বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,/মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।' 〈র ৩ : ৫৩৭〉

(ঘ) মৃত্যুর নূতনত্ব—যা অপ্রত্যাশিতভাবেই অকস্মাৎ পুরাতনের অবসান ঘটায় : 'পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,/নূতন বাহিরি এল।' 〈র ৩ : ৫৪৪〉

(ঙ) দেহের অতীত দেহ—যা বহির্বিষয় থেকে অপসৃত অন্তর্মুখী একাগ্রতায় দেহকেও অনুভূতির বিষয় করে তোলে : 'দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর/ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।/শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি' (র ৩ : ৫৫৬), এবং যারই ফলে কবি লিখতে পারেন, 'দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়/দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি।' 〈র ৩ : ৫৪০〉।

(চ) মৃত্যুর পরিপক্কতা—যে বিষয়ে কবি একাধিকবার অনেক কিছু বলেছেন, এবং এখন লিখছেন, মৃত্যুদূত আবার যখন আসবে 'তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন/নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভাবে/ ... চরিতার্থ হবে শেষে/জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ' 〈র ৩ : ৫৪১〉।

(ছ) উৎক্রান্তি—যে ধারণার বৃন্তে উদগ্র মৃত্যুচেতনার দলগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়েও একত্র। একত্র কেননা প্রত্যেকটিই জীবন-মরণের সীমান্তলগ্ন ভাবনা। এপার-ওপার দুই কিনারাই তার

প্রেক্ষিতে, তাই তাদের মধ্যবর্তী এই অন্তর্মুখ জ্ঞান তার প্রান্তিক অবস্থান সম্পর্কে *শেষ সপ্তক* থেকেই সম্পূর্ণ অবহিত; বোঝে যে পেরিয়ে-আসা, ছাড়িয়ে-যাওয়াই তার ধর্ম, এবং 'দুই বিরাট আধ-খানা'র মাঝখানে 'একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে/ আপন প্রান্তরেখায়।' 〈র ৩ : ২২১〉

শুধু সেই অবস্থান থেকেই একদিকে দেহের অতীত নিজ দেহকে 'কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি' ভেসে যেতে দেখা সম্ভব, আর অপরদিকে 'সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া' দেখা 'তমসের পরপার' প্রভাতসূর্যের বন্দনায় লেখা যায় 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,/ তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি/আপনার আত্মার স্বরূপ।' 〈র ৩ : ৮৪৯〉 মৃত্যুচেতনায় দেহাতীত ও আত্মজিজ্ঞাসার এই টান এবং বিরহে চিরবিরহের টান— উভয়ের প্রতিচ্ছেদে বিদেশিনীর ভাবচ্ছবিটা উৎক্রান্তিরই অনুকীর্তন। তার গায়ে অভিজ্ঞতার দাগ যা মুছবার নয়; তা-ই তার আকর্ষণ। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো ছোটো মৃত্যুর ইতিহাস থেকে তা অবিচ্ছেদ্য; তাই মহামরণের মাধ্যাকর্ষণেও সে পার্থিবের কক্ষচ্যুত নয়। এই দোটানার স্পন্দনেই তার সৌন্দর্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গীতবিতান-এর প্রকৃতি

গানের বহি

নথিখানা

প্রথম পরিচ্ছেদে 'এক বসন্তের গান' থেকে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কী গভীর ঘনিষ্ঠতায় প্রকৃতির সঙ্গে লিপ্ত বোধ করতেন। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের চিন্তায় ও কবিতায় এই ধারণাটার যে প্রবল উপস্থিতি তার কিছু উদাহরণও আলোচনা করা হয়েছে। সেই শেষাংশকে এখন কবিসত্তার সামগ্রিক ইতিহাসের কাঠামোয় রেখে ভাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কেননা, কবি নিজেই নানা প্রসঙ্গে বহুবার বলেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে তিনি বিশেষ এক প্রকার আত্মীয় সম্বন্ধে যুক্ত। প্রাবন্ধিক রচনা ছাড়াও সেকথা তিনি বিস্তারিত লিখে গেছেন *গীতিবিতান*-এর প্রকৃতি খণ্ডে। সেখানে প্রত্যেকটি গানই এ-বিষয়ে তাঁর শিল্পের ও চিত্তবৃত্তির বিশ্বস্ত দলিল। কবিত্বের উৎকর্ষে সবগুলিই সমান নয়। কিন্তু যেখানে তা দুর্বল, সেই দুর্বলতাই প্রকৃতি ও কবির আত্মীয়তার সাক্ষ্য। *গীতবিতান*-এর 'প্রকৃতি'কে তাই সংগতভাবেই একরকমের নথিখানা বা আর্কাইভ বলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রত্যেক নথিখানার জন্যেই আগে থেকে ভেবেচিন্তে মেপেজুখে ঠিক করে নিতে হয় সংগৃহীত জিনিসগুলি কোথায় রাখা হবে।

রবীন্দ্রসংগীতের এই বিশেষ নথিখানাটির জন্য কবিসত্তার স্থাপত্যে একটা স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখনই যখন তার কোনো অংশ বিন্যস্ত থাকে সমগ্রের কাঠামোয় এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী ফাঁকা জায়গাটা ভরে ওঠে গানের পর গানে।

সব নথিখানারই ঝোঁক থাকে সঞ্চয়ের ওপর। কোনো কিছুই যেন বর্জনীয় নয় সেখানে। সেদিক থেকে দেখলে গোটা *গীতবিতানই* মহামূল্য সংকলন। গানগুলি স্বতঃস্ফূর্তির ফসল। 'প্রকৃতি'ও তাই। অতএব স্বাদে ও প্রকারে, এবং রচয়িতার রীতি ও চিত্তবৃত্তির নিদর্শন হিসেবে প্রত্যেকটি গানই মৌলিক নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে। প্রকৃতি-খণ্ডের নথিখানা সেই মৌলিকতায় ঠাসা। তাই এ পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমাদের চেষ্টা 'এক বসন্তের গান'কে আস্বাদন করা *গীতবিতান*-এর 'প্রকৃতি'র সামগ্রিক কাঠামোয় বসিয়ে।

কিন্তু এই গানগুলি পড়বো কী ভাবে? প্রশ্নটা ওঠে এজন্যে যে শুধু *গীতবিতান*-এই নয়, প্রকৃতি বিষয়ক নানা চিন্তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির কোনো পর্বেই সে প্রসঙ্গ তাঁর কবিত্বের প্রেক্ষিতে অনুপস্থিত নয়। তবে সুদীর্ঘ কবিজীবনে সেই প্রেক্ষিতেই কবিত্ব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বারবার বদলে গেছে। সেজন্যেই এ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসঙ্গটা কবির নামেরই মতন অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেই একই কারণে এবিষয়ে যে-কোনো আলোচনায়, ঐতিহ্যেরই টানে, অতিব্যাপ্তির বিপদ খুব বেশি : কিছু ভাবতে গেলেই মনে হয় গোটা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে মোকাবিলা না করে এক পা এগোবার উপায় নেই।

সেই সমগ্রতার ছায়া থেকে কিছুটা সরে এসে, অথচ তাকে

স্বীকার করেই, কবিত্ব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্যকে আমরা দেখতে চাই বিশেষ একটি পাঠ্যের স্পষ্ট-দাগা সীমানার চৌহদ্দিতে— *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডের আলোকে। ফলে, আশা করি, কবির স্বনির্দিষ্ট আওতায় তাঁরই বিচারবুদ্ধি ও বক্তব্যের সাহায্যে এ আলোচনায় একদিকে যেমন তাঁর মতামতের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে, তেমনি আরেক দিকে সেই চিন্তা যখন নিজেকে ছাপিয়ে উৎক্রান্ত হচ্ছে তাও অগোচর রবে না।

গানের বই-এর অনির্দেশ্যতা

গীতবিতান গানের বই। আমাদের উদ্দেশ্য বইটা, বিশেষ করে তার প্রকৃতি-খণ্ডখানি, গীতিকাব্য হিসেবে পড়া। পড়তে গিয়ে একটা খটকা লাগছে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে গানকে কবিতা বলে পড়তে চাই। এবিষয়ে কবির আপত্তি তো ছিলই না, বরং প্রশ্রয় ছিল। গোলমাল হচ্ছে বই কথাটা নিয়ে।

গীতবিতান কোনো সাধারণ অর্থেই ঠিক বই নয়। ১৯৩১ সালে ১১২৮টি গান নিয়ে প্রকাশিত দুই খণ্ডে গান প্রচুর আছে। কিন্তু সে গ্রন্থে বিষয়গত সংলগ্নতা কিছু নেই বললেই হয়। পূজা প্রেম প্রকৃতি স্বদেশ ইত্যাদি সবই এক একটি ধারণাসূত্রে গ্রথিত, কিন্তু কোন্ ধারণা যে কোথায় শুরু বা শেষ হয়েছে তা বলা শক্ত। সীমানাগুলি এতই ঘেঁষাঘেঁষি যে তাদের বক্তব্যে সত্যিকারের প্রকারভেদ কিছু চোখে পড়ে না। ফলে পড়ার কাজ বিঘ্নিত হয় : এক বিষয়ের গানকে আরো কয়েকটি বিষয়ের গানের সঙ্গে পাশাপাশি মিলিয়ে না দেখলে কবির বক্তব্য বোঝা যায় না।

এই বিষয়গত অনির্দেশ্যতাই যে বইটি পড়ার একমাত্র সমস্যা তা

নয়। গানগুলিও এমন যে বিষয়ভাগে আরো পরিচ্ছন্ন হলেও আরেক দিক থেকে তাদের চরিত্রগত অনির্দেশ্যতা এ সংকলন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হতো না কিছুতেই। কেননা স্বতঃস্ফূর্তিই এ গানের স্বভাব। কবিতা হিসেবে তার যা কিছু ভালো বা মন্দ তা সম্ভব হয়েছে এই স্বতঃস্ফূর্তিরই ফলে। বইটা পড়তে পড়তে তাই মনে হয় যে গানগুলি যেন বিষয়ে অধ্যায়ে পরিচ্ছেদে সজ্জিত সাধারণ বইয়ের জন্য রচিত হয় নি। কেননা তারা প্রত্যেকটিই কবি-মানসে স্বত-উৎসারিত স্ফূর্তির উদাহরণ।

প্রত্যেকটিই সেই চঞ্চল মুহূর্ত যাতে সত্তার স্বাক্ষর লেখা হয় গীতিকাব্যের ক্ষণিকতায়। পাঠক যদি সেই রসের আস্বাদ পেতে চায়, তাহলে তাকেও বই পড়ার প্রত্যাশা বর্জন করে কবিত্বের আবেদনে সাড়া দিতে হবে সহৃদয়তায়। সহৃদয় পাঠক যেহেতু কবিত্বের বেদনার ভাগী তাই তার পাঠে সে এই গানকে নিজের করে নেয় আপনারই অভিজ্ঞতা, মানসিকতা ও জীবন-দর্শন দিয়ে।

কিন্তু এই যে নিজের-করে-নেওয়া তার ফলেই আবার তার পাঠ্যে অনির্দেশ্যতার নতুন এক মাত্রা যুক্ত হলো। গান এখন সরে এসেছে পাঠকের অন্তর্লোকে। যেমন, প্রকৃতি-খণ্ডে যা ছিল বহির্জগতের নিয়মে-বাঁধা নৈসর্গিক ঋতু-পঞ্জিকার ঘটনা এবং স্বতঃস্ফূর্তির আবেগ ও চাপের দ্বারা পরিচালিত, তা এখন পাঠকের ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব আকর্ষণ-বিকর্ষণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে অনির্দেশ্যের নতুন জটিলতা, নতুন নতুন সম্ভাবনা।

সহৃদয় পাঠকের দায়িত্ব তাই *গীতবিতান*-কে অন্য যে-কোনো বইয়ের মতন না ভেবে তার এই ত্রিমাত্রিক অনির্দেশ্যতার অনুকূল এমনি কোনো কৌশলে তা পড়ার চেষ্টা করা যে পাঠকের ব্যক্তিসত্তা ও তার

পাঠ্য তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে, একটি অপরটির প্রশ্রয়ে, এই সংকলনের সম্ভাবনাকে অফুরন্ত আবিষ্কারের সুযোগে পরিণত করতে পারে।

এই আবিষ্কারের সুযোগ তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যে। প্রতিটি খণ্ডই গড়ে উঠেছে এক একটি মূল ধারণাকে ঘিরে, কিন্তু সে ধারণা আবার অভিজ্ঞতার দ্বারা সংক্রামিত হয়ে কবির বক্তব্যকে বিচিত্র করে তুলেছে। পূজা, প্রেম ও স্বদেশ খণ্ডে মূল ধারণাটি প্রধানত আদর্শ-কেন্দ্রিক। অভিজ্ঞতাও মানসিক— পূজার আত্মনিবেদনে, প্রেমের আত্মজিজ্ঞাসায়, স্বদেশের দেশাত্মবোধে। বিচিত্রের লীলা অন্তর্লোকের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতি-খণ্ডের গড়ন, অন্য তিনটির তুলনায়, আলাদা রকমের। বহির্লোক ও অন্তর্লোকের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদই তার সাংবিধানিক ভিত্তি। তার একদিকে সচেতন অনুভূতিশীল ব্যক্তিসত্তা যা অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংসার-যাত্রায় তার পথ করে নেয়। আর অন্যদিকে নিশ্চেতন প্রকৃতি যা অহংভাব বর্জিত নিরপেক্ষ নৈসর্গিক সত্তা। অভিজ্ঞতা বলতে তার কিছু নেই। তাই ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্তর থেকে বাহিরে এসে প্রকৃতির উদাসীনতায় ঠেকে যায়, এবং প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে অন্তর্লোকেই। তবু মানসিকতার শোষণে অভিজ্ঞতা নিঃশেষিত হয় না। বরং বহির্লোকের নৈসর্গিকতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ ও সমঝোতা করেই তাকে চলতে হয়। ঘরে-বাইরে এই নিরন্তর যাতায়াতই প্রকৃতি-খণ্ডে বৈচিত্র্যের লীলা, তার আবিষ্কার ও আনন্দ বলে গণ্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সহজেই বোঝা যায়, কেন প্রকৃতি-খণ্ডের পাঠে গোড়া থেকেই কতকগুলি নিয়ম বেঁধে নামলে পাঠকেরই লোকসানের আশঙ্কা বেশি। কারণ, অভিজ্ঞতা কতখানি

বিচিত্র হয়ে উঠবে তার অনেকটাই নির্ভর করে নৈসর্গিকের স্বাধীনতা কত অবাধ হবে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তার এই খেলায়। অবশ্য, প্রকৃতির কিছু কিছু সাধারণ নিয়ম যে পাঠকের জানা আছে তা ঠিকই। কিন্তু কেবল সাধারণ তত্ত্ব বা ফরমুলা দিয়ে বিচিত্রকে জানা সম্ভব নয়। তাকে জানা যায় বিশেষে। সেই বিশেষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির খামখেয়ালির অন্ত নেই। সেখানে সে যা খুশি করতে পারে। তাই পাঠককে অভাবনীয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুন নতুন বিচিত্রের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য খোলা মনে অবস্থা-বিশেষে পড়ার কায়দা তৈরি করে নিতে হবে।

গীতবিতান-এর প্রকৃতি

স ত্তা

বর্ষা ও সত্তা-সমস্যার গুরুত্ব

গীতবিতান-এর প্রকৃতি-খণ্ডে সত্তার প্রশ্নটাই প্রধান, কেননা কবিসত্তার বা 'আমি'র সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ কী তাই এখানে গানের মূল বিষয়। অবশ্য সব কবিতাই যেহেতু কবির আত্মজিজ্ঞাসা, তাই কবিতামাত্রই আত্মবিষয়ক। তবে সর্বত্রই যে সত্তার কথা সরাসরি বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ যদিও কোনো না কোনো ভাবে সত্তার প্রশ্ন ছুঁয়েই কবিকে কবিতা লিখতে হয়, তবুও সত্তাই সব কবিতায় অনুকীর্তনের বিষয় হয়ে ওঠে না।

গীতবিতান-এর বর্ষা তার ব্যতিক্রম। যেমন, 'ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে' (# ৬৩) বা 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে।' (# ৬৬) একই দিনে (২২শে শ্রাবণ, ১৩২৯) লেখা এদুটি গানে প্রকৃতি ও আমি-র সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যবহিত। তৃতীয় কোনো সত্তা বা শক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াই 'আমি' ঝড়ের গানে, তার নাচনে ও সুরে সাড়া দিতে পারে, চোখ হারিয়ে যায় 'ওই ছায়াময় দূরে', সজল হাওয়ায় 'একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান' ওঠে। (# ৬৩)/ তেমনি, একেবারে সরাসরিই, অপর গানটিতে (# ৬৬) 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে/সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।' দিঘির জলে মেঘের ছায়া, ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যার সজল সুর

ইত্যাদি সবই 'সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।' একলা কবি ও একা আকাশের মধ্যে আর কেউই নেই : 'আঁধার বাতায়নে/একলা আমার কানাকানি ওই আকাশের সনে।'

এজন্যেই রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শনে তাঁর যে রচনাগুলি অবশ্যপাঠ্য 'বর্ষা' তাদের অন্যতম। অন্য কোনো ঋতুতেই সত্তার কথা এতগুলি গানের বিষয় নয়। এমনকি বসন্তও নয়। *গীতবিতান*-এ বসন্ত ও বর্ষাই সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে। সংখ্যার হিসাবে এদুটির মধ্যে বর্ষাই বড়ো—বসন্তের ছিয়ানব্বইটি গানের (# ১৮৮-২৮৩) তুলনায় বর্ষার একশো-পনেরোটি (# ২৬-১৪০)। সত্তা প্রসঙ্গেও সেই অনুপাতে বর্ষার গরিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। তথ্যটা কেবল গোনাগুনতির ব্যাপার নয়। অন্য ঋতুর চেয়ে অনুভূতির গভীরতা 'বর্ষা'য় যে অনেক বেশি, সেই গুণগত বৈশিষ্ট্যও এই গরিষ্ঠতার প্রমাণ।

অনুভূতির যে-গভীরতার কথা বলা হলো তার মাপকাঠিটা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, একাকিত্ব। কিন্তু কবি কি সত্যিই একাকী? কবিতা তো একাকী নয়। যে-পাঠক তার জন্যে অপেক্ষায় আছে, তার পাঠেই কবিতা ধন্য হবে, তৃপ্ত হবে আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে। তবে স্রষ্টার ভূমিকায়, কবিতার জন্মলগ্নে কবি যে সত্যিই একাকী তাও অনস্বীকার্য। এতই একাকী যে সদ্যোজাত শব্দসন্তানটিও তাকে চমকে দেয়—কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া। নিজের চিন্তাভাবনার ভ্রূণটিকে নিজেরই উচ্চারণে স্বতন্ত্রভাবে ভাষাশরীরে মূর্ত দেখার অভিজ্ঞতা একদিকে; আবার অন্যদিকে, সঙ্গেসঙ্গেই সে অভিজ্ঞতার ওপর আত্মজ ও প্রসূতির আদিম সম্বন্ধের অধ্যাস—ঐতরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার এই টানাপোড়েনেই কবির একাকিত্বের বিশ্বস্ত ইতিহাস রচিত হয়।

কিন্তু এই ইতিহাসেরই নিয়মে প্রত্যেক কবিই কবিত্ব ও প্রকৃতির

সম্পর্কটা গড়ে নেয় নিজের মতন করে তার মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কেননা প্রকৃতি এতই সার্বত্রিক যে ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ ছাঁচে সাজিয়ে না দেখলে তা বুদ্ধির অগোচরে নিখিল শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। দৈনন্দিন সংসারযাত্রায় একই ব্যক্তিকে একাকিত্বের প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক ভাবে, কারণ যে-বিশেষে তার প্রকাশ তার ছাঁচগুলি তৈরি হয় ভেদাভেদের অনন্ত বৈচিত্র্যে। রবীন্দ্রসংগীত যে ব্যক্তি-আমির রচনা তাঁকেও তাই প্রকৃতি ও সত্তার সম্বন্ধ-কাহিনী লিখতে হয়েছে নানা বিধায়—কখনো বিরহ-চেতনায়, কখনো স্মৃতি-বেদনায়, কখনো আদিমতার অনুভবে।

রবীন্দ্রনাথের সত্তা-দর্শনের একটা প্রধান ঝোঁক যে উৎক্রান্তির দিকে সেকথা *কবির নাম ও সর্বনাম* পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাই এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে প্রসঙ্গভেদে সে উৎক্রান্তির রূপ একেক রচনায় একেক রকমের। সত্তাপ্রসঙ্গে 'বর্ষা'য় তাকে দেখা যায় একপ্রকার আদিমতার অনুভবে যেখানে স্মৃতি ও বিরহের স্বতন্ত্র দুই ধারা উথলে উঠে মিলিত হয়েছে বহুকালের পুরাতন বেদনায়। যে আটটি গানে সেই উদ্বেল মুহূর্তটা বিশদভাবে ব্যক্ত তার প্রাচীনতায়, বেদনায় এবং কোটালি অনুভবের টানে, সেগুলি একসঙ্গে পড়লে উৎক্রান্তির এই বিশেষ রূপটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

১৯১০ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত দুই দশকে লেখা এ গানগুলিতে একাকিত্ব কোথাও আস্তিত্বিক প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল বা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, কোথাও প্রতীক্ষারত, কোথাও বিরহী বা স্মৃতিজর্জর। একটিমাত্র গানে ছাড়া অন্যত্র কোথাও কবুল করে বলা নেই যে কবি একাকী। তবে প্রতীক্ষা বিরহ ও স্মৃতির মনোবৃত্তি থেকে তা সহজেই অনুমেয়। একাকিত্বের বিচ্ছিন্নতাই মাত্রা ছাপিয়ে উৎক্রান্ত হয়েছে উল্লিখিত আটটি গানে।

গানগুলির প্রত্যেকটিতেই কবিসত্তা প্রকৃতির সঙ্গে অব্যবহিত সম্বন্ধে যুক্ত। আটটিতেই তার বর্ণনা বিশেষ একটি উল্লেখ-বিন্দু স্পর্শ করে গানকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চৈতন্যের আদিমতায় যখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যের। ত্রিকালের মধ্যে বর্তমানই সবচেয়ে সন্নিহিত। সেই আদিম বর্তমানই যে অনেককাল বাদে ফিরে আসছে আরেক যুগে আরেক আমি-র বর্তমানে অনুকীর্তিত হয়ে, তা বোঝা যায় গানগুলিকে কালানুক্রমিক সাজিয়ে পড়লে। পড়লে দেখা যাবে যে একদিকে কবিজীবনের মধ্যাহ্নে সুপরিণত রচনায় বিন্যস্ত সন-তারিখে চিহ্নিত ঐতিহাসিক বর্তমান, অন্যদিকে গানের ভাষায় খানিকটা এলোমেলো করে সাজানো প্রাগৈতিহাসিক বর্তমানের দাগ—আর এ-দুয়ের বৈপরীত্যে ভাস্বর সত্তার অবিস্মরণীয় ভাবমূর্তি *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডে।

আটটি গান

১০ আষাঢ়, ১৩১৭/ইং ১৯১০

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে (# ৯৮)

আটটির মধ্যে সবচেয়ে আগে লেখা এই গানে বর্ষার শুরু। আষাঢ় এসেছে, কিন্তু এসেছে যে তা কেবল ঋতুচক্রের রুটিন-বাঁধা নিয়মেই নয়। সে-নিয়মে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো নির্ণায়ক ভূমিকা নেই; সবটাই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া, মানবিক চৈতন্য ও অনুভূতি যেখানে অবান্তর। কিন্তু এই যে আবার-আসা, আষাঢ়ের এই আসায় এমন কিছু আছে যা আজকের 'নূতন মেঘের ঘনিমা'কে অনুবাদ করে নিচ্ছে পুরনো অতীতের ভাষায়, 'এই পুরাতন হৃদয়'এর সংবেদনশীলতায় যা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদিম আত্মীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বর্তমান গাঁথা হয় সেই বর্তমানের ডোরে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯/ইং ১৯২২

কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে (# ৬৪)

বাদল-ছোঁওয়া লেগে, হয়তো গ্রীষ্মশেষের বাদলায়, মাঠের ও মাটির রং বদলে গেছে, আকাশের মেঘ নেমে এসে সব কিছু সবুজে ঢেকে দিয়েছে। কখন যে দিয়েছে কেউ জানে না, সবটাই হঠাৎ ঘটে গেল—

'হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো'। কিন্তু যে-গান হঠাৎ-গাওয়া, তারও কিছু পূর্ব-ইতিহাস থাকে কথায়, সুরে, গহন কোনো স্মৃতির সঞ্চয়ে। ঘটনার ধাক্কায় সে অতীত তার হারিয়ে-যাওয়া বর্তমানকে খুঁজে পায় নবীন এক বর্তমানে।

তেমনি ঋতুচক্রের আবর্তনে কোটি কোটি পুরাতন শেষগ্রীষ্মের সবুজ ফিরে এসেছে আবার এক নববর্ষায়। আস্তিত্বিক টানে 'ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে'। কারণ, সেই তৃণদলের সাথে 'আমার প্রথম যুগের চেনা'। এভাবেই এই বাদলের কাহিনীকে জুড়ে দেওয়া হলো সেই বাদলের কাহিনীর সঙ্গে তিনটি কথায়—'প্রথম যুগের চেনা'।

যুগ শব্দটা কালবাচক। যেমন-তেমন কাল নয়, বিশেষ এক কাল। কালের স্রোতে ভেড়ি বেঁধে মানুষ তা আত্মসাৎ করেছে যাতে নিজের কাহিনীটা অব্যাহত বলা যায় সেই উদ্দেশ্যে। কত কাহিনী কতভাবে যে বলা হবে তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই, তাই ভেড়ির বাঁধও কোনো নিয়ম-বাঁধা ছক মেনে চলে না। যেমন, বঙ্কিমের যুগ বলতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও প্রসারের বিশেষ এক পর্ব বোঝাতে পারে, আবার প্রসঙ্গান্তরে বাংলা সাহিত্যেরও কোনো না কোনো অধ্যায় বোঝাতে পারে, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে বঙ্কিমী রচনারীতি বা উপন্যাস কিংবা উপন্যাসেরই ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিশেষ কোনো দিক।

এখানেও যুগটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে 'প্রথম' শব্দটির দ্বারা। কেননা, প্রথম বলতে বোঝায় তা-ই যা অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় বর্তমানে রচিত এই গানের প্রেক্ষিতে প্রথম যুগই সেই প্রথম বর্তমান যখন প্রকৃতি ও মানুষ আদিম অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে জড়িত।

প্র. আষাঢ় ১৩২৯/ইং ১৯২২

বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে (# ৭১)

প্রথম বর্তমান ও তার প্রথম আষাঢ় পরবর্তী প্রতি আষাঢ়েই পুনরাবৃত্ত হয়ে পৌঁছয় দ্বিতীয় বর্তমানের আষাঢ়ে। দুই বর্তমানের মধ্যে বহু যুগের ব্যবধান। কিন্তু সময়ের এই বিপুল দূরত্ব সত্ত্বেও মাঝখানকার আষাঢ়গুলি হারিয়ে যায় না, স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে।

আজ এক নব আষাঢ়ের আগমনে স্মৃতির পটে লেখা পুরনো কাহিনীগুলি আবার নতুন করে মনে পড়ে। তারই অনুষঙ্গে আরেক আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আরেক কবির ছন্দে রচিত একটি কাহিনী আজ ঝরো ঝরো বাজে এই ধারাবর্ষণেও। সেদিনের মিলন-মালাগুলি ধুলোয় নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় তার গন্ধ এখনও লেগে আছে। সেদিনের রেবা নদীও নেই, সবুজ পাহাড়গুলিও নেই। তবুও আজ, 'এমনি' দিনের মেঘ-বর্ষণে সেই ঘনঘটা, সেই একই বারি-ঝরার উপমা। বিরহিণী সেদিন যে প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিল, আজ আষাঢ়ের বেদনায় 'সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে'।

২২শে শ্রাবণ ১৩২৯/ইং ১৯২২

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে (# ৬৬)

আগেই এ-গানটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে আমি ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এখানে অব্যবহিত। কোথায় আকাশ আর কোথায় আমার বুক। তাই তার মনের কথা যখন আমার বুকের মাঝে ঝরো ঝরো বাজে, তখন বুঝতে হয় যে অন্তর-বাহির এক হয়ে গেছে স্মৃতির রসায়নে। দিঘির কালো জলে যে মেঘের ছায়া ঘনায়, ঝিঁঝিঁ-ডাকা সজল সন্ধ্যায় শোনা

যায় যে স্মৃতি-মলিন পুরনো কথার মর্মর— এ সবই প্রকৃতি ও অনুভূতির মধ্যে সরাসরি অনুবাদের নমুনা, এক বর্তমানের বেদনাকে সঞ্চারিত করা আরেক বর্তমানের বেদনায়। সাময়িকতার সেই সূত্রেই

বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

২২শে শ্রাবণ ১৩২৯/ইং ১৯২২

একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে (# ৭৩)

প্রকৃতি ও অনুভূতি, পুরনো বর্তমান ও নতুন বর্তমানের মধ্যে সেই একই প্রকার অনুবাদের সুর শোনা যায় এ-গানেও—'সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে'। পুরনো সাময়িকতা এখানেও নবীন কালকে ছুঁয়েছে 'প্রথম'এর উল্লেখ-বিন্দুতে, কিন্তু ছুঁয়েছে তার বিশেষ এক অবস্থায়—'সুদূর আঁধার আদিকালে'।

কে সে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল আনি,

'আজ আষাঢ়' যে-প্রথমকে সুরে তালে তার সমকালীন বর্তমানে অনুকীর্তন করছে তা আর কোনো ঐতিহাসিক অতীত নয় এখন। সে-অতীতের নাম 'সুদূর আঁধার আদিকাল'। অন্য অতীত থেকে তার প্রভেদ এ নয় যে তা দূরস্থ ও অস্বচ্ছ। মৌলিক প্রভেদ এই যে সময়ের ক্রমে এখন কিছুই নেই, এমন কিছুই থাকতে পারে না যাকে বলা যায় আদিকালের পূর্ববর্তী।

এই অর্থেই বাল্মীকি আদিকবি। এজন্যেই গীতায় কৃষ্ণের পক্ষে বলা সম্ভব হয়, 'অহম্ আদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ'। (১০/২)

এই শ্লোকটির ইংরেজি অনুবাদে 'আদি' শব্দটা সাধারণত source বা origin বলে লেখা হয়ে থাকে। কেননা, জন্মই সবচেয়ে আদিম ঘটনা, সব কিছুরই গোড়ার কথা। জন্মের মতোই আদিমকালও অন্ধকারে আবৃত, তার রহস্য—গীতার ভাষাতেই—দেবতা ও মহর্ষিদেরও অজানা (ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবম্, ন মহর্ষয়ঃ)। জানা নেই বলেই দূরত্বে তা অনধিগম্য। এই গানেও শোনা যায় সেই সুদূর আদিকালের কথা। প্রথম সুরে তালে তা যে প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল তাও প্রকৃতির গর্ভে মানুষের জন্মরহস্যের ইঙ্গিত, মানুষ ও প্রকৃতির জন্ম-সম্বন্ধের অজ্ঞেয় প্রথম প্রহরের কাহিনী।

২২শে শ্রাবণ ১৩২৯/ইং ১৯২২

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে (# ৭৬)

বৃষ্টিশেষের হাওয়ার গুঞ্জরণ বুকের শিরায় শিরায়। এটুকু ছাড়া এই নামে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের অনুভূতির সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো সংবাদই নেই। বাকিটার বিষয় সবই ঐ একই তারিখে লেখা 'একি গভীর বাণী এল' (# ৭৩) গানটির মতো 'কত যুগের কত মনের কথা'। তবে আদিম জন্ম-রহস্যে তার কৌতূহল নেই। কীভাবে সেই মনের কথাগুলি ফিরে ফিরে আসে তা-ই কবির জল্পনা। তার নিয়ম তিনি খুঁজে পেয়েছেন ঋতুচক্রের আবর্তনে। 'অলখ তারে' প্রকৃতির সেই পুনরাবৃত্তিই এযুগের বর্তমানে সেযুগের মনের কথা বাজায় 'অচিন বীণা'য়।

অবশ্য ঋতুচক্রের আবর্তনের মতো এই পুনরাবৃত্তি নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী নয়। ঋতুর চাকা চলে নিজের মতন করে, মনের কথা সম্পর্কে সে উদাসীন। কিন্তু সেই চলা যখন অনুভূতির

দ্বারা গৃহীত হয়, তখনই তা মনের কথা হয়ে ওঠে। তখনই ঘাসে ঘাসে, ফুলে ফুলে তার চলার চিহ্নগুলি দিয়ে তৈরি হয় সুরের মালা, বুকের শিরে শিরে শোনা যায় বৃষ্টিশেষের হাওয়ার গুঞ্জরন। সেই গুঞ্জরন, যাতে 'কত যুগের কত মনের কথা বাজায় ফিরে ফিরে', যা বাজে বহিঃপ্রকৃতির নিয়মের সমান্তরাল আরেক নিয়মে—অনুভূতির নিয়মে।

১৩ই শ্রাবণ ১৩৩৬/ইং ১৯২৯
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে (# ৫৪)

প্রকৃতি ও মানুষের আস্তিত্বিক সম্বন্ধে যত দিক থেকে যত সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়, তা করা হয়েছে এই গানে। চোখ ডুবে আছে নবীন ঘাসে, কানে শ্রাবণ-গানের মল্লার, বনে বনে যে-আন্দোলন 'অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা', ধানের ক্ষেতে অঙ্কুরের যে বাণী 'সেই বাণী মোর সুরে আনে'। চোখে, কানে, ভাবনায়, শরীরে প্রকৃতির অব্যবহিত আকর্ষণ—

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।

আকর্ষণের মুখ আজকের বর্ষায়-ভেজা মাটির দিকে, কিন্তু সে অদ্যতনও 'পুরাতন প্রাণের টানে' বাঁধা। প্রাণ-কথাটা রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন জড়বিজ্ঞানের প্রৈতি (ইং এনার্জি) অর্থে, কখনো বা প্রাণীবিদ্যার জীবনীশক্তি অর্থে, কখনো বা তাঁর সত্তাদর্শনে চৈতন্যের ধর্ম হিসেবে। শেষোক্ত অর্থে এখানে প্রাণের টান মাটির দিকে, যে-মাটির সঙ্গে জন্মগত একাত্মতায় কবি মানুষের প্রকৃতি-সম্বন্ধকে তার আদিমতায় চিন্তা করেছেন বহু রচনায়।

[শ্রাবণ ১৩৩৬]

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে (# ৫৬)

বর্ষার গানগুলিতে অস্তিত্বের যে দিকটা বেশি চোখে পড়ে তা বিরহ ও বিষাদের দিক। স্মৃতিও সেখানে বিরহ-বেদনার বাহন অনেক গানে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন এই গানে।

শ্রাবণের আমন্ত্রণে এখানে মুক্তির প্রতিশ্রুতিই বড়ো কথা। 'দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে/ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।' ব্যক্তিসত্তা মুক্তির জন্য অধীর। পৃথিবী যে-নাচের তালে মেতে উঠেছে তাতেই সে যেন এক্ষুনি যোগ দিতে চায়। হর্ষ ও উল্লাস এই মেজাজের সঙ্গে মানায়। তাই 'প্রথম যুগের বচন' শুনে যে স্মৃতির টান তাতে কাতরতা নেই, পিছুটান নেই। ভাবনা চলে 'কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে'। প্রকৃতির সঙ্গে আদিম সম্বন্ধে মিলিত হওয়ার কথায় পশ্চাৎ অপসারণের প্রস্তাব নেই। নতুন এক বর্তমানের প্রেক্ষিতে তার আকর্ষণ সম্ভাবনার দিকে।

সম্ভাবনা বলতে বোঝায় সেইরকম হওয়া যা হবে—যা হয়নি, হচ্ছে না, যা ভবিষ্যৎ। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, এটা কোন্ কাল যা একাধারেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ? এটা 'কালহারা' কাল। সেই কাল, যখন ত্রিকালের নামগুলি যুগের পর যুগ পুনরাবৃত্তিতে ক্রমিক কালের ঋজুতা থেকে ছিটকে পড়ে মহাকালের জপমালায় গ্রথিত হয়। বারবার ফিরে-আসা তার স্বভাব। প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধের ইতিহাসে সেই প্রত্যাবর্তনই নিত্যকালের স্বাক্ষর।

গীতবিতান-এর প্রকৃতি

আ দি ম তা

প্রকৃতি এবং স্বয়ং-আমি

কবিতা ও গান ছাড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্যত্রও আদিমতার কথা খুব ছড়াছড়ি না হলেও নিতান্ত বিরল নয়। *ছিন্নপত্রাবলী*-র[১] অনেক চিঠিই তার প্রমাণ। গানে যা বলেছেন, চিঠিপত্রের মন্তব্যে তার পরিপূরক চিন্তা-ভাবনা বেশ কিছু পাওয়া যায়। বস্তুত, পদ্য ও গদ্য না মিলিয়ে পড়লে এবিষয়ে পড়ার কাজই অসম্পূর্ণ থাকে। কবি নিজেই মনে করেন এর কারণ খুঁজতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের ইতিহাসে: 'কলকাতায় থাকলে নিত্য নতুন কথা বলা সহজ, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটিমাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং স্বয়ং আমি।' 〈১৪৭〉

সাহাজাদপুরের পথে যেতে ৭ জুলাই ১৮৯৪ তারিখের এ চিঠিতে প্রকৃতি ও স্বয়ং-আমি-র এই সান্নিধ্যের কথাই মাসখানেক বাদে 〈৮ অগাস্ট ১৮৯৪〉 শিলাইদহ থেকে লেখা বর্ণনায় আরও বিশদ করে বলা হয়েছে :

'এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার মানসিক ঘরকন্নার

সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে—যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন—সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেরিয়েছে। এখানকার দিনগুলি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অঙ্কিত।

'আমাদের দুটো জীবন আছে—একটা মনুষ্যলোকে আর একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি।' ⟨১৫৭⟩

অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা

প্রকৃতি-সম্বন্ধে কবিসত্তার এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সত্যটা একবার চোখ বুলিয়ে পড়লেই ফুরিয়ে যাবার নয়। প্রসঙ্গভেদে এই কথাগুলি নানা দিক থেকে নানান ভাবে পড়ার মতো। আদিমতা বিষয়ে কবির চিন্তা এতই বহুমুখী যে তা নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্যকেও কিছুটা কেটেছেঁটে স্থির লক্ষ্যে রেখে ভাবা দরকার।

গানখণ্ডের পাঠে দেখা গেছে যে আদিমতা-বোধের মধ্যে বিশেষ একটা আঞ্চলিক ঝোঁক আছে। ঋতুচক্রের বিশেষ বিশেষ পরিবেশে তা সবচেয়ে মুখর ও প্রখর হয়ে ওঠে সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে। উপরকার উদ্ধৃতিতে 'এখানকার প্রকৃতি', 'এখানকার দিনগুলি' এবং 'এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা ও অনাবৃত মধ্যাহ্ন' তারই স্বীকৃতি।

'অনাবৃত', কেননা অব্যবহিত। কবিত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে তৃতীয় পক্ষ আর কেউ নেই। তাই, সে সত্তার সদা-মৌন সদা-গোপন

অংশটির পক্ষেও সেই নিভৃত প্রহরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে অসংকোচে সঞ্চরণ করা সম্ভব হয়। সন্ধ্যা ও দুপুরের যে-বৈশিষ্ট্যের উপর জোর পড়েছে তা হচ্ছে তাদের নির্জনতা ও নীরবতা।

শিলাইদহ থেকে ১৬ই অগাস্ট ১৮৯৪-তে লেখা চিঠিতে সন্ধ্যাবেলাটা 'এমন নির্জন নিস্তব্ধ' যে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষের মতো নিবিড়ভাবে 'আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়', এবং 'আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি।' ⟨১৬২⟩

তেমনি আবার, 'এখানকার দুপুরবেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।' ⟨২১; পাতিসর, ৭ মাঘ [১৮৯১]⟩ তিন বছর পরে সাজাদপুরেও একই অনুভূতি : 'এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষতঃ কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর—সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে।' ⟨১৬৬; সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪⟩।

এই আকুলতা যে নতুন কিছু নয়, তাও বলা আছে একই চিঠিতে : 'আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে।' কোনো যেন আদিম যোগাযোগের বশে 'সমস্ত দীর্ঘদিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায়, কী রকম করে কাটত!' ⟨১৬৭⟩ দুদিন বাদেই আবার সাজাদপুর থেকে 'রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুরবেলার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে।' ⟨১৬৭; ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪⟩

ধ্বনি

কিন্তু কেবল সাজাদপুর শিলাইদহের নির্জনতা নিস্তব্ধতা ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে সত্তার আদিমতা-বোধকে সজাগ করে তুলতে পারে না। তার জন্যে চাই নীরবতার বিপরীত ধারণা ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতায় ধ্বনি, বিশেষ করে জলের ধ্বনি, যে প্রায়শই তাঁর স্মৃতির বাহন হয়েছে, শৈশবের অনেক কথাই যে সেই সূত্রে অনুকীর্তিত হয়েছে বার্ধক্যের প্রান্তিক বর্তমানে, তা নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১] এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে শৈশব-বাল্যের স্মৃতির চেয়েও অনেক পুরনো আদিমতার অনুভব জল ও ধ্বনিকে আশ্রয় করেই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে ঋতুচক্রের নানা বর্ণনায়।

গীতবিতান-এর 'বর্ষা'য় তাই শ্রাবণ-ভাদ্রের ধারাবর্ষণে শোনা যায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দোঝংকার : 'বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব-কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয় এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে। ... বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়। 〈১৬৪; কুষ্ঠিয়ার পথে, ২৪শে অগাস্ট ১৮৯৪〉

কদিন আগে শিলাইদহে শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় খানিকটা বেড়াবার

১. এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পর বোটে ফিরে এসে জল আর ধ্বনির অনুষঙ্গে লেখেন, 'ঈষৎ শারীরিক শ্রান্তির পর সেই চৌকি, সেই জ্যোৎস্না, সেই জলের কল্লোল স্বর্গসুখ বহন করে আনে। ... কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, ... আকাশব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়— চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মতো পড়ে থাকি।'

তিন বছর আগে ঐরকমই এক জ্যোৎস্নারাত্রিতে সাজাদপুরে তিনি লিখেছিলেন, 'মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায় ... এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন ভেসে যায়।' ... এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখন সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই।' ⟨৩২; ২২শে জুন ১৮৯১⟩

সন্ধ্যায় জলের ধ্বনি-সংকেতে প্রকৃতির সঙ্গে আদিম স্নেহ-সম্বন্ধের স্মৃতিতে শাবীরিকতার যে দিকটা ছিল তা-ই আবার দুপুরের নিস্তব্ধতাকেও অনুবাদ করে আদিমতা-বোধের ভাষায় : 'আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে। ... তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপর এসে লাগতে থাকে— মনে হয় এই

জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে।' প্রকৃতির সঙ্গে এই দৈহিক সান্নিধ্যের অনুভূতি ঘটছে জলেরই কাছাকাছি, পাতিহাঁস যখন তাতে নেমে সশব্দে পালক পরিষ্কার করছে এবং জলের বেগে ঘাটে-বাঁধা বোটের কাছিটা ও সিঁড়িটা 'এক রকম সকরুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে।' ‹২৩; সাজাদপুর, ২৩শে জুন ১৮৯১›

প্রাত্যহিকের চিরকাল

দুপুরের এই সকরুণ মৃদু শব্দের ভূমিকায় শিলাইদহ থেকে ২ কার্তিক ১২৯৮-এর চিঠিতে কবি একাধারেই জন্ম ও মরণের দুই অন্ধকার রহস্যের মধ্যে মানবসত্তার 'চিরকাল'কে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় রচিত প্রকৃতির মাতৃমূর্তির পাশেই। একদিকে, নদীর দুই তীরের গাছের ছায়ায় 'শত শত বৎসর গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে— এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠেছে, আই গো অন্ ফর এভার।' আবার, অন্যদিকে, নিস্তব্ধ দুপুরে হঠাৎ দূর থেকে কোনো রাখালের ডাক তার সঙ্গীর উদ্দেশে, একটা নৌকোর দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ, ঘাটের কাছে স্রোতে মেয়েদের ঘড়ার ঠেলা লেগে জলের ছল্‌ছল্ শব্দ, এবং তারই সঙ্গে দুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্‌গুনানি, বাতাসের ধাক্কায় বেঁকে বেঁকে বোটটার 'এক রকম কাতর সুর'—সবমিলিয়ে 'এখন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান—যেন মা সমস্ত বেলা বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে।' ‹৪৬›

এই আদিম স্নেহ-সম্বন্ধের বর্ণনা স্পষ্টতই দৈশিক। ঐসব গ্রাম

নদী খাল বিলের নাম সবই একটি বিশেষ পরিবেশে তার আঞ্চলিকতার সাক্ষী। তবে, এই ঘরোয়া ছবিটাও অচল বা অনড় নয়। কালিক উৎক্রান্তির টানে সেখানে এসে পড়েছে প্রাত্যহিকের চিরকাল, এক দুপুরের মৌন ছাপিয়ে ছুটছে শত শতাব্দীর সকরুণ শব্দস্রোত।

সেই আকর্ষণেই আদিমতার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় উৎক্রান্তির ঘোর লাগে, ধরণীর প্রতি 'নাড়ীর টান'এ মনে পড়ে সেই সময়ের কথা যখন স্বয়ং-আমি ধরিত্রী-মা'র স্নেহের কাঙাল শুধু নয়, যখন সে তার সঙ্গে একাত্ম—'আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি ... জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম।' ‹৭৯›

এই অস্পষ্ট মনে-পড়া, 'আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত'—এই যে মনের ভাব তাকেই তিনি বলছেন, এই বিশেষ অবস্থায়, 'সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।' আমরা যে আদিমতাকে দেখেছিলাম কবিসত্তার সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার দৈশিক পর্যায়ে, তা-ই এখন কালিক উৎক্রান্তিতে যেন সেই 'চেতনার প্রবাহ' যা 'পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।' ‹৭৯; শিলাইদহ ২০ অগাস্ট ১৮৯২›

কিন্তু উৎক্রান্তির ইতিহাসে এই পর্যায়ই শেষ কথা নয়। নতুন জীবনের আবেগে সত্তার স্পন্দন থেকেই আরেক অধ্যায় লেখা শুরু

হয়ে যায়। শিলাইদহেই আঞ্চলিক প্রকৃতিতে আত্মমগ্ন অবস্থায় আদিমতার সেই উপাখ্যান রচিত হয়েছিল। এতে কোনো অব্যক্ত অর্ধ-চেতনার দ্বিধা নেই। সরাসরি বলা হচ্ছে যে 'আমি বেশ মনে করতে পারি' যখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, শুধু অধীর আদি-সমুদ্র 'অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে' আঁকড়ে ধরে দিনরাত দুলছে, তখন স্বয়ং-আমি পৃথিবীর সঙ্গে তার সব ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্যের ঊর্ধ্বে 'এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।'

দৈশিক অবস্থায় যা প্রকৃতি-মা ও মানব-শিশুর সম্পর্ক তা এই কালিক উৎক্রান্তির ভাবচ্ছবিতে মাটি ও গাছের সম্পর্ক : 'আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম।' সে গাছে ফুল ফুটতো, নতুন পাতা গজাতো, বর্ষায় মেঘ করলে 'তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত।'

এই কাহিনীর শেষ নেই। কেননা, 'তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।' ‹৮৩; শিলাইদহ, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২› কোন্ দুজনের কথা বলছেন কবি? গাছ আর মাটি, না মানুষ আর প্রকৃতি, না দুই-ই? এই প্রশ্নের আলোকে স্বয়ং-আমি ও প্রকৃতির আত্মীয় সম্বন্ধকে বোঝা যাবে কী অর্থে? পাঠক নিজের মতন করে ভেবে নেবেন। উৎক্রান্তির কাজই হলো দ্বিধা দিয়ে, দ্ব্যর্থতা দিয়ে ভাবলোকে সম্ভাবনার দেউড়িগুলি খুলে খুলে এগিয়ে যাওয়া মহলের পর মহল।

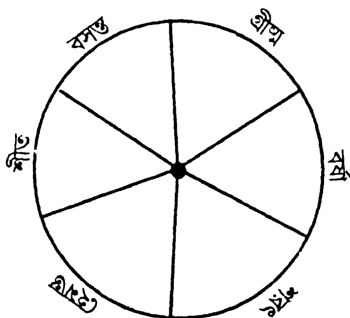
গীতবিতান-এর প্রকৃতি

দুই রীতি

দুই রীতি : ঋতুর চাকা আর ঋতুর থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত ছয় ঋতুর রঙ্গশালায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। প্রত্যেক ঋতুই তার নিজস্বতায় বিশিষ্ট। প্রত্যেকটিই গড়ে উঠেছে তার মূল ভাবনাকেন্দ্রকে ঘিরে, এবং সে কেন্দ্রীয় ভাবনাগুলির কোনোটিই বাকি আর পাঁচটির মতন নয়। রসে ও মেজাজে ছয় ঋতু ছ'দিক থেকে অনন্য বলেই তারা এত বিচিত্র, এত রঙ্গ তাদের নিয়ে কবির ও কালের নাট্যশালায়।

তবে এই মৌলিক প্রভেদ সত্ত্বেও ঋতুচক্রের আবর্তনে একটা



ঝোঁক লক্ষ করা যায়। কোন্ ভাবনাকেন্দ্র কত শক্তিশালী তদনুযায়ী অপেক্ষাকৃত সবল ও দুর্বল দুটি জোটে বিভক্ত হবার ঝোঁক। এই রেখাঙ্কনে যেমন একদিকে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষার অপেক্ষাকৃত সবল জোট, আরেকদিকে শরৎ হেমন্ত শীতের দুর্বল জোট। সবল জোটের তিন ঋতুরই কেন্দ্রস্থ বীজ-ভাবনাগুলি খুব ঘনসংবদ্ধ, দুর্বল জোটের বীজ-ভাবনাকেন্দ্রের তুলনায়।

অবশ্য উভয় জোটের মধ্যে কিছু কিছু মিলও আছে : উভয়েই প্রত্যেক ঋতুতে তার পূর্ববর্তী ঋতুর স্মৃতি এবং পরবর্তী ঋতুর সম্ভাবনা গভীর তাৎপর্যে অধ্যস্ত রয়েছে। তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবুও সে-মিল সত্ত্বেও মানতে হয় প্রবল ঋতুর বীজ-ধারণা এতই সংহত যে অধ্যাসের চাপে তা হারিয়ে বা তলিয়ে যায় না। দুর্বল ঋতুর বীজ-ধারণা সে তুলনায় অনেক বেশি হালকা, ফলে পূর্বস্মৃতি ও আসন্ন ভবিষ্যতের মধ্যে তার ছড়িয়ে যাবার মিলিয়ে যাবার আশঙ্কা অনেক বেশি।

গীতবিতান-এর প্রকৃতি-খণ্ড যে কবিতার মতো পড়া যায় তা কবি নিজেই বলেছেন। কিন্তু তা ছাড়া আরো এক দিক থেকে যে পড়া সম্ভব তাও তিনি স্বয়ং দেখিয়েছেন ১৯২৬ সালে রচিত ও অভিনীত *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা*-য়। রচনা ও প্রকাশনার মধ্যে লেখাটা অনেকখানি বদলে যায় লেখকের নিজেরই উদ্যোগে। প্রথমত, অভিনয় চলতে চলতেই তার পাঠে অনেকটা অদল-বদল ঘটে প্রযোজনার তাগিদেই, এবং দ্বিতীয়ত, কয়েক বছর পরে 'সন্নিবেশক্রমের বহু পরিবর্তনসহ' কবি ১৯৩১ সালে মুদ্রিত নতুন এক পাঠে পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণ দুটির সমন্বয় করেন। (গান : ৭৪৮)

পরিবর্তনগুলি জরুরি হয়ে ওঠে নাটকীয়তার দাবিতে। ছয় ঋতুর

চাকায় যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত গান, তা-ই ছয় ঋতুর থিয়েটারে শোনা গেল পাত্রপাত্রীর গলায় উত্তর, প্রত্যুত্তর ও স্বগতোক্তির নানা উচ্চারণে। নাটকীয় বলেই প্রত্যেকটি উচ্চারণ কোনো-না-কোনো ঘটনা বা প্রাসঙ্গিকতার কাঠামোয় সাজানো ব্যাখ্যা বা বক্তব্য। আর, এ-নাটকের সূত্রধার যেহেতু স্বয়ং কবি, নিজেই যিনি গানগুলি লিখেছেন, তাই তাঁকে এখানে দেখা যাচ্ছে পাঠকেরও ভূমিকায়। নাটক যেমন *ঋতুরঙ্গশালা*-য় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগোচ্ছে, তিনিও তেমনি গীতিকবিতা-গুলিকে একটির পর একটি পাঠে শ্রোতা ও দর্শকের কাছে বলে যাচ্ছেন ধারাবাহিক এক কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরায়।

ঋতুচক্রের স্বতঃস্ফূর্তিকে এভাবে *ঋতুরঙ্গশালা*-র নাটকীয়তায় দেখার ফলে কবি ও পাঠকের মধ্যে বিনিময়ের সম্ভাবনা আরো প্রসারিত হয়েছে। যে-কোনো কবিতাই এক অর্থে কবি ও পাঠকের মধ্যে দান-প্রতিদানের ক্ষেত্রবিশেষ। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কবির পক্ষে নিজেই নিজের পাঠকরূপে উপস্থিত থাকার সুযোগ জোটে না, যেমন জুটেছে এইখানে। আমরাও তার সুযোগ নিয়ে চেষ্টা করবো, যেখানেই দরকার, কবির পড়াকে আমাদের পড়ার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে।

তবে একটা মুস্কিল আছে। *গীতবিতান*-এর 'প্রকৃতি'তে মোট গানের সংখ্যা ২৮৩। তার মধ্যে মাত্র ২৯টা 'প্রকৃতি' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ঋতুরঙ্গশালার অন্যান্য কবিতাগুলি যোগ করলে সবসুদ্ধ একুনে ২৯+২৬ = ৫৫। অর্থাৎ কেবল এক-পঞ্চমাংশেই গান আর নাটকের প্রতিচ্ছেদ ঘটেছে বলা চলে। আর এই প্রতিচ্ছেদেই কবিকে দেখা যায় তাঁর দ্বৈত ভূমিকায়—সংগীত রচয়িতা এবং নাটকের সূত্রধার রূপে।

গীতবিতান-এর বর্ষা

গীতবিতান-এর 'বর্ষা'কে এই দ্বৈতভাবের দৃষ্টান্ত বলে কথাটা আলোচনা করা যায়। যে-প্রতিচ্ছেদে উভয় ভাবকে পাশাপাশি রেখে পড়া সম্ভব, তা থেকে সাংগীতিকতা ও নাটকীয়তার মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলের দিকটাই বড়ো হয়ে দেখায়। কেননা প্রকৃতির বর্ণনা উভয়েরই ভাবলোকের বর্ণনা। ঋতুরঙ্গশালার সূত্রধার নিজেই সে-কথাটা দিয়ে তাঁর নাটকের শুরু করেছেন—

> ...নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম্ম।

নটরাজের নাচ। নাচ বলেই তার ছন্দটাকে দুই পদক্ষেপের বৈপরীত্যে জোড়ায় জোড়ায় বর্ণনা করা সম্ভব :

বাহিরে	অন্তরে
বহিরাকাশ	অন্তরাকাশ
রূপলোক	রসলোক
আবর্তন	উন্মথন
জগৎ	জীবন

বাইরে-ভেতরে রবীন্দ্রদর্শনের একটা মূল ধারণা যা একাধারেই তাঁর বৈদান্তিক চিন্তাকে তাঁর বিশ্ববীক্ষার সমাহারে মিলিয়েছিল। অন্তরে-বাহিরে সে ধারণারই সৃষ্টি একদিকে অন্তরাকাশের রসলোক, অন্যদিকে বহিরাকাশের রূপলোক— অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের দুই

দেশ বা স্পেস্ যার একটি ভাবনা ও কল্পনায় পরিশীলিত অনুভূতির বিষয়, এবং অপরপক্ষে যার অন্যটি প্রধানতই কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধশক্তির দ্বারা অব্যবহিত ভাবে নির্দিষ্ট।

বাইরে রূপায়িত বলেই দ্বিতীয়টিকে আবর্তন-বিবর্তনের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু রসলোকের সে বালাই নেই, নিজের সীমা ছাপিয়ে উন্মথিত হওয়া, উৎক্রান্ত হওয়াই তার স্বভাব। যথাক্রমে তারা কবির জগৎ ও জীবনের উপমা। এবং যেহেতু তিনি পৃথিবীর কবি, তাই জগৎ ও জীবনের ডায়ালেক্টিক তিনি সহজেই মেলাতে পারেন নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে।

ফলে *গীতবিতান*-এর গান এবং গানের সঙ্গে নাচ ও আবৃত্তি মিলিয়ে ''নটরাজ'' পালাগানের মূলগত ঐক্য সহজেই চোখে পড়ে। গানে যা অনুভূতির আনন্দ তা-ই নাটকে 'উপলব্ধির আনন্দ'। মেজাজে বা মনোবৃত্তিতে তারা মোটামুটি একই রকমের বলা যায়। যেমন, *গীতবিতান*-এর বর্ষায় কবিসত্তার আস্তিত্বিক দিকটাই প্রধান, *ঋতুরঙ্গশালা*-র বর্ষায়ও তাই। উভয়েরই বিরহ প্রতীক্ষা ও স্মৃতি বহু যুগের পুরনো এক আদিম বেদনার বাহন, যা কবির মতে, তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তার সাক্ষ্য।

গীতবিতান-এ সেই আদিমতার কথা লেখা হয়েছে বর্ষার আটটি (৫৪, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৯৮ সংখ্যক) গানে, আর ঠিক তারই নির্যাস পাওয়া যাবে *ঋতুরঙ্গশালা*-য় 'বর্ষার প্রবেশ' থেকে 'শ্রাবণ বিদায়' পর্যন্ত গীতিনাট্যের (৬, ৭, ৮, ৯ সংখ্যক) গানে ও (৮, ৯, ১০ সংখ্যক) আবৃত্তিতে। একই বক্তব্যের অনুবাদ এক রীতি থেকে আরেক রীতিতে।

তবে কোনো অনুবাদেই এক পক্ষ অপর পক্ষের অবিকল নকল

নয়। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের পথে মূলের অর্থ অনেকটা হারিয়ে যায়। দুই রীতির মধ্যে অনুবাদেও অর্থহানি ঘটে। একই ভাষা হলেও এক রীতিতে যা বলার কথা তার সবটা অন্য রীতিতে বলা হয়ে ওঠে না। কেননা প্রত্যেক রীতিই তার পরিবেশকে নিজের মতন করে নেয়। বস্তুত, পরিবেশকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতাই রীতির নিজস্বতা। সেই নিজস্বতাই অনুবাদে বিঘ্ন ঘটায়, আর অনুবাদ বিঘ্নিত বলেই সংসারে বিচিত্রের মেলা বসে যায়, যা প্রাত্যহিকের অভ্যাসগত তাও রহস্য ও আবিষ্কারের আনন্দে ভরে ওঠে।

তাই প্রশ্ন ওঠে, *গীতবিতান*-এর বর্ষার যে আদিমতা আর নটরাজ পালাগানে ভিন্ন রীতির যে আদিমতা—তা কি একই? না কিছু হারিয়ে গেছে এই অনুবাদেও? দুই পাঠ পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যাক উত্তর কী।

নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এ-প্রসঙ্গে গানের মূল বক্তব্য সবটাই নাটকে পাওয়া যায়। তবে যে ভাবে তা বলা হয়েছে তাতে সংগীতের চেয়ে আবৃত্তির উপরই জোর পড়েছে বেশি। সংগীতের মধ্যে একমাত্র 'গগনে গগনে আপনার মনে' ব্যতীত বাকিগুলি কবিতা হিসাবে উৎকর্ষের দাবি করতে পারে না। আবৃত্তিতেও কেবল 'যায় রে শ্রাবণকবি রসবর্ষা ক্ষান্ত করি তার' সত্যিকারের কবিতা বলে পড়া যায়।

বাকি দুটি আবৃত্তি 'আষাঢ়' (# ৮) এবং 'বর্ষামঙ্গল' (# ৯) আশ্চর্য দক্ষতায় চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে পালাগানের রীতিতে গানগুলির বক্তব্যকে অনুকীর্তন করেছে। কিন্তু করেছে বিবৃতির দ্বারা। আসলে সে বিবৃতির উদ্দেশ্য ত্রিপদী তর্কপদ্ধতির নিয়মে প্রতিপাদ্যকে বর্ণনাত্মক উদাহরণের সাহায্যে প্রতিপাদিত বলে প্রমাণ করা। এখানেও

একই কায়দায় # ৮ ও # ৯-এর কাজ, অনুকীর্তনে, গানের অনুভবকে নাটকের উপলব্ধিতে পরিণত করা। এদিক থেকে তার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বরং সেই সাফল্য থেকেই বোঝা যায় গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনা আর পালাগানের যুক্তিসিদ্ধ নাটকীয়তার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ও কতটা।

গীতবিতান-এর শরৎ

অবশ্য দুই রীতির মধ্যে প্রভেদ সবক্ষেত্রেই যে এত স্পষ্ট তা নয়। ঋতুর চাকা যেই একটু ঘুরলো অমনি বর্ষার পরেই এলো শরৎ। বর্ষায় বীজ-ধারণাটা বেশ সংহত, এবং তদনুযায়ী তা, আমরা জানি, অপেক্ষাকৃত প্রবল ঋতুগুলির অন্যতম। শরৎ তার তুলনায় হীনবল। কেননা একদিক থেকে দেখলে তার কোনো বীজ-ধারণাই নেই। তার ভাবরূপে এমন কোনো কেন্দ্র নেই যাকে ঘিরে বীজ-ধারণাগুলি দানা বাঁধতে পারে।

অথচ, আরেক দিক থেকে দেখলে জোর করে বলা শক্ত যে কেন্দ্রিকতার অভাবে এই ঋতুর বাঁধুনি কোনো অর্থেই শিথিল হয়ে পড়েছে। বরং নিষ্কেন্দ্রিক বলেই শরৎ এমন একটি ধারণায় দৃঢ়সংবদ্ধ যে তাতে শৈথিল্যের সুযোগই নেই। ধারণাটা হলো অনির্দেশ্যতা। অনির্দেশ্যতাই যার স্বভাবগত, কেন্দ্র দিয়ে তার কী হবে?

অল্প বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনির্দেশ্যের দিকে একটা স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁক লক্ষ্য করেছিলেন নিজের মধ্যে। তাই অবাক হবার কিছু নেই যে তিরিশটি গান নিয়ে *গীতবিতান*-এর শরৎ সংকলনে (# ১৪১-১৭০; পৃ. ৪৮১-৯৩) কেন্দ্রিকতার ওপরে ততটা জোর

পড়ে নি। বস্তুত, কেন্দ্রিকতা সেখানে নিতান্তই অবান্তর। ১৮৮৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ ২৫ বছর থেকে ৬৬ বছর বয়সে, যৌবন থেকে বার্ধক্যের চার দশকে রচিত সে গানগুলি নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্যের নানা স্তরের অভিব্যক্তিতে অনির্দেশ্যের বর্ণনা নিয়েই ব্যস্ত।

সেই বর্ণনার মর্মকথা অভাব-বোধ। সে-কথা দিয়েই 'শরৎ'-এর শুরু হয়েছে ১৮৮৬ সালে লেখা যে-কবিতায় তাও এদিক থেকে খুব স্মরণীয় তথ্য। স্মরণীয় কেবল এজন্যে নয় যে কবিতাটি নবীন যুবা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিকতার সাক্ষী। সে মানসিকতা এমনই একটা আস্তিত্বিক টিপসই যে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের ইতিহাসে আগাগোড়া তার সত্য সদাস্বীকার্য। সত্যটা এই যে তাঁর কবিত্ব সর্বদাই চালিত হয়েছে নেতির দ্বারা—'এ নহে, এ নহে, নয় গো'।

এই যে-নেই, যার অ-ভাব তা অস্তিত্বেরই বিশেষ একটা অবস্থা যখন সে নিজেই নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আত্মহারা হয়ে আপনারই অন্য-আমিটিকে খুঁজছে শরতের প্রভাতস্বপ্নে, তার অনির্দেশ্যতায়—'কী জানি পরান কী যে চায়।' কী চায় জানে না। শুধু এটুকুই জানে যে 'আজি কে যেন গো নাই', তাই জীবন বিফল।

যে-নেই তা অবশ্য আপন-হারা আমি। ঐতরিকতার চরম মাত্রায় কবি-সত্তা নিজের এই অনির্দেশ্যতাকে বুঝতে চাইছে শরতের উপমায়। কেননা শরতের বীজধারণাটা অনির্দেশ্যতা। কবিত্বের চেষ্টা সেই ধারণাকে প্রকৃতির মধ্যে রূপায়িত করতে, যেমন এই ঋতুর বিখ্যাত গান 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা'য় (# ১৫০; পৃ. ৪৮৫-৮৭) গানের উদ্দিষ্ট এখানে শেফালিবন নয়, কেবল তার 'মনের কামনা' যা সংজ্ঞার্থেই অমূর্ত। তাই এত মিনতি—'তুমি মুরতি ধরিয়া

চকিতে নামো-না', কিংবা 'মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না'।

অভাব-বোধকে এই প্রকার প্রাকৃতিক ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে রূপায়িত দেখার ব্যাকুলতা কখনো শেষ হবার নয়। কেননা প্রকৃতি যে কত রূপে মানুষের মনের কামনাকে উপমায় সাজিয়ে প্রকাশ করে তার ইয়ত্তা নেই। তবে যে-কোনো পাঠ্যেই তা লেখকের অভিপ্রায় ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত *গীতবিতান*-এর শরৎও তেমনি তিরিশটি গানের সীমানির্দিষ্ট সংকলন। তার মূল বিষয় অভাব-বোধ। প্রকৃতিতে তার অভিব্যক্তি দুটি ধারণার অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এইসব গানে। একটি হচ্ছে ক্ষণিকতার ধারণা, আর অন্যটি অন্তর-বাহিরের ধারণা।

এই ধারণা দুটি শরতের অনির্দেশ্যতাকে যে প্রাকৃতিক উপমায় খুঁজে পায়, তার খানিকটা এই গীতিকাব্যে দেখা যায় ভাবচ্ছবিতে, আর কিছুটা তার পরিচয় পাওয়া যায় গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবনায়। ভাবচ্ছবিগুলির মধ্যে ফুলেরই ছড়াছড়ি বেশি, তার মধ্যে আবার শিউলির ও মালতীর। তবে মালতী কেবল অনির্দেশ্যের বিদায়ী দিকটাই দেখায়, যে-ঋতুটা চলে যাচ্ছে, ঝরে পড়ছে সেই বর্ষার দিকটা। তুলনায় শিউলিতে শরতের আসা এবং যাওয়া, তার স্বভাবগত অস্থায়িত্বের উভয় রূপই সে ঋতুর অনির্দেশ্যতার বিশ্বস্ত প্রমাণ। তাই মোট ৩০টা গানের মধ্যে ১৫-টায় বা প্রেমখণ্ড যোগ করে ৩৩টার মধ্যে ১৮-টায় শেফালি/শিউলি/শেফালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যে তিনটি ভাবনাগুচ্ছে ক্ষণিকতার প্রকাশ সেই নশ্বরতা, সন্ধিক্ষণ আর চঞ্চলতা—তার সর্বত্র শিউলিরই প্রাধান্য। ফুলটা এসেই আবার ফিরে যেতে চায় : 'রাতের বায় কোন্ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়/ ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল।' (#১৪৭; পৃ. ৪৮৪) যা কিছু অস্থায়ী, যেমন যে-গান গাইতে চাই কিন্তু 'বাণী

মোর খুঁজে না পাই', তা ছড়িয়ে পড়ে শিউলিদলে এবং তারই মতন 'ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে।' (# ১৫৭; পৃ. ৪৮৯) কিংবা শারদপ্রাতে যখন রাত পোহায় তখন ভাবতে হয় প্রাণের ভিতর থেকে অগোচর কথা যে-বাঁশিতে বাজতো তা কার হাতে দিয়ে যাবো। কেননা এদিকে 'সময় যে তার হল গত/ নিশিশেষের তারার মতো,— /শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ-সাথে।' (# ১৬৫; পৃ. ৪৯২) ৬৪ বছর বয়সে লেখা এ-গানে ক্ষণস্থায়িত্বের ধারণায় স্পষ্টতই মৃত্যুর ছায়া পড়েছে।

এই নশ্বরতাই ক্ষণস্থায়িত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন। বিরহও নশ্বরতারই প্রকারভেদ। আস্তিত্বিক অভাব-বোধের বশে অকারণ বিরহ-বেদনাই হোক (# ১৪১), কিংবা শিউলিকে মিলনের এবং মালতীকে বিরহের ভাবচ্ছবি ধরে ঋতুর আবাহনই হোক (# ১৬২; পৃ. ৪৯১), শরৎ, যে 'ক্ষণিকের অতিথি', যে থাকার জন্য আসে নি—অ-তিথি, চলে যাবার জন্যই এসেছে, সে মিলনছলে বিরহ আনে। মিলন শুধু আপন-হারা মানুষের ঐতরিকতাকেই প্রখর করে তোলে। শরতে প্রতিটি মিলনই তার চির-বিরহ, চির-একাকিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। (প্রেম # ১৬২; পৃ. ৩৩৬)

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এই বিরহ ও মিলন দুই-ই ঘটে থাকে শরতের সন্ধিলগ্নে। সব সন্ধি-লক্ষণের মতোই তারা দ্ব্যর্থক। আরম্ভিক সন্ধিক্ষণে একদিকে বর্ষার বিদায় 'যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন'এ, আরেকদিকে 'শিউলিবনের মধুর স্তবে' শরৎলক্ষ্মীর আগমন প্রতীক্ষা। অনির্দেশ্যের এই টানাপোড়েন দিয়ে শরতের শুরু। (প্রেম # ১৭০, পৃ.৩৩৮) তাই শরৎ-প্রাতেই বিদায়ের বাদ্য, শোনা যায় : 'সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী'। কেননা অস্থিরতাই এ ঋতুর

স্বভাবগত, সে কেবল গান শোনাতেই আসে, তার সময় নেই বসে থাকবে—'গান রেখে যাস আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই র'বি।' কিন্তু চলতে চলতেই, ইতিমধ্যে, আরেক সন্ধিক্ষণ এসে পড়ে। শরতের আনন্দসভায় শেষ বীণার তান বাজে, শরৎমেঘের ক্ষীণ ধারা ক্ষণিকতারই তুলনা মনে হয় প্রকৃতিতে যেখানে সব কিছুই নশ্বর, নাগকেশর মিলিয়ে যায় ধুলোয়, শীতের হাওয়া লাগতেই অনির্দেশ্যতা মৃত্যুর উপমায় জ্বলে ওঠে—'গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা', আর আমলকী-বন 'মরণ-মাতা' ঝরা পাতার হাওয়ায়। (প্রেম # ১৭৩; পৃ. ৩৩৯)

এই নিরন্তর আসা-যাওয়া, অনির্দেশ্যের এই নাটকীয় পট-পরিবর্তন সম্ভব এজন্যেই যে শরৎ সদা-চঞ্চল। সর্বদাই সে পথে পথে। মাঝে মাঝে শ্রাবণের পাগলামি যখন আশ্বিনকেও খেপিয়ে তোলে তখন 'পথ-ভোলা এই পথিক'ই হয় অনির্দেশ্যের দূত। 'পথের বেদন' ছড়িয়ে পড়ে তারই চঞ্চলতায়। (# ১৫৫; পৃ. ৪৮৮) কখনো আলোতে কখনো আঁধারে, সে 'এই আছে এই নেই।' (# ১৬৮; পৃ. ৪৯৩) তবে অস্থিরতার এ পাগলামিতেও বিশেষ একটা ঝোঁক লক্ষ করা যায়—অন্তর থেকে বাহিরের দিকে নিষ্ক্রমণের ঝোঁক।

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে॥

... ...

আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা॥

(# ১৪৩; পৃ. ৪৮২)

কাজ নেই। ছুটি। যা সুনির্দিষ্টের নিয়মে বাঁধা তার থেকে ছুটি। এজন্যেই ছুটির ঋতু শরতে সারা বেলা বিনা কাজে বাঁশি বাজিয়ে

কাটানো যায়। নিয়মে বাঁধা না হলে কাজ হয় না। বাধাবন্ধনহীন অনির্দেশ্যতাই সত্যিকারের মুক্তির শর্ত। কিন্তু তার জন্যে আকাশ ভেঙে বাহিরকে লুট করতে হবে কেন? অবাধ মুক্তির এই বীজ-ধারণাটা আকাশের উপমায় ভাবা যে কত উর্বর, কত দূর যে তা কবিসত্তায় ব্যাপ্ত তার কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় যদি তাকে আঠারো বছর পরে, আরেক শরতে, প্রৌঢ় বয়সে লেখা সেই বিখ্যাত গানটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি—

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে (প্রেম # ২৩; পৃ. ২৭৯)

শরৎ আসন্ন। মালতী ঝরে পড়ছে, কাশের ফুল হাওয়ায় দুলছে, শিউলি কুঁড়িগুলি 'বাঁধন টুটে' ফুটে উঠতে আর দেরি নেই—মাটির পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যায় যে শরৎ এসে গেছে।

অথচ, কবির কানে ছুটির বাঁশি বাজছে 'ওই নীল গগনে'। বরং মাঠে মাঠে, বনে বনে যা ঘটছে তার জন্যেই যেন তাঁর চোখ ঐ আকাশে—'সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে'। নজরটানটা পাঠক নিজেই যোগ করে নেবেন। কেননা মানুষ যদি প্রকৃতির মধ্যেই আপন-মনের উপমা খুঁজতে চায়, তাহলে মহাকাশের মতো আকাশ আর নেই। আকাশ বলতে বোঝায় অবকাশ। তার সীমাহীন শূন্যে, মহাশূন্যে, তাই অবাধ মুক্তির উৎসবে সারা বেলা কাজ-ভোলা ছুটির বাঁশি বাজে।

শীত বা গ্রীষ্মকে যদি ভাবা হয় কঠোর নিয়মনিষ্ঠ তপস্বী, তাহলে শরতের অনির্দেশ্যতায় শুনতে পাওয়া যায় প্রথম আলোর বাণী—'আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী, তাই বাইরে ছুটেছি।' (# ১৪৯; পৃ. ৪৮৫) সেই আলোয় 'বাহির হয়ে বিহার করে/যে ছিল মোর মনে মনে।' (# ১৫১; পৃ. ৪৮৭) এই সেই ঋতু যখন বলা যায়,

'আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হল পাখা তুলি'। (# ১৬৭; পৃ. ৪৯২) এই আশ্বাসেই মানুষ বলতে পারে যে আকাশ ভেঙে মুক্তির চরম অবকাশ বাহিরটাকে সে লুট করে নেবে।

তবে এই স্পর্ধাকে প্রকৃতিতে বা অতিপ্রাকৃতে পলায়নের চেষ্টা বলে মনে করা ভুল হবে। কেননা নীল গগনে ছুটির বাঁশি বাজে যার জন্যে, সে-ই আবার সারারাত মেঠো ফুলের পাশাপাশি শুয়ে তারার বাঁশি শোনে—'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে/আমার মেঠো ফুলের পাশাপাশি,/তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।' আকাশে চোখ রেখে আপন-মনে যে সুর খোঁজে মহাশূন্যে, সেও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে—

এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে,
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।

(# ১৫৮; পৃ. ৪৮৯)

পৃথিবীর কবি মানুষকে প্রকৃতির উপমায় ভেবে মনুষ্যত্বকেই আরো মহৎ করে তুলেছেন পার্থিবতায়।

অনির্দেশ্যতার এই লক্ষণগুলি সবই *ঋতুরঙ্গশালা*-য় বর্ণনা করা হয়েছে। হয়েছে এমন ভাবে যে, খুব সংক্ষেপে কিন্তু বিচক্ষণ নির্যাসে গানের মূল কথাটা নাটকেও অটুট আছে, যদিও *গীতবিতান*-এর ৩৩টা গানের তুলনায় নটরাজে গান ও আবৃত্তি মিলিয়ে মোট রচনার সংখ্যা ৮টি—গান ৫টি ও আবৃত্তি ৩টি। নিষ্কেন্দ্রিক বলেই শরতের ক্ষেত্রে এই সংকোচন সম্ভব হয়েছে যা অন্যান্য ঋতুর ক্ষেত্রে করা যায়নি। অন্যত্র কেন্দ্রীয় ধারণা বজায় রাখার জন্যেই নাটকীয় সংক্ষেপণে গীতিকাব্যের স্বতঃস্ফূর্তি অনেকটা খোয়াতে হয়েছে।

একককথায়, অনির্দেশ্যের নিজেরই যে কবিত্ব আছে তাই নটরাজে স্বীকৃত এবং সেই স্বীকৃতিতেই এ-নটরাজের মৌলিকতা। মুক্তির যে অবকাশ তৈরি হয় অনির্দেশ্যের সম্ভাবনায়, যে সম্ভাবনার শেষ নেই, কবিতার স্থান সেখানেই। সেই স্থানটাই বারবার আবিষ্কার করা হয় কবির শিল্পে, এবং তা-ই একই পাঠ, এমনকি একই শব্দ নতুন করে পড়তে ও ভাবতে সাহায্য করে। *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডের তুলনায় নটরাজ যতই সংক্ষিপ্ত হোক, রবীন্দ্রনাথ সেই মিতবাক পাঠ্যেই নতুন কথা নতুন করে বলার ও ভাববার অবকাশ খুঁজে পেয়েছেন 'পাঠান্তর'এ।

শব্দটি চিহ্নিত করে দেওয়া হলো এজন্যেই যে *রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪ : গান*-এ তা ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ এক পারিভাষিক অর্থে। 'প্রথম ছত্রের সূচী'তে তার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সূচিটি যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁদের সকলকেই সম্পাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় স্বীকার করতে হয় এক পাঠ থেকে আরেক পাঠে যাবার রাস্তাটা এখন কত সহজ হয়ে গেছে। আর গানগুলি যেহেতু রচনাকাল অনুযায়ী সাজানো তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রতিটি পাঠান্তরই যে-কোনো দুটি পাঠের মধ্যে কালিক ব্যবধানের উদাহরণ। বস্তুত, সন-তারিখের পঞ্জিকা ছাড়াও কালিকতা ঐ অন্যার্থক 'অন্তর'এই নিহিত এক পাঠ থেকে আরেক পাঠে যাবার পথে বিলম্ব তো ঘটবেই, এবং সেদিক থেকে দেখলে পাঠান্তরকে যে-কোনো পাঠ ও তার অনুপাঠের মধ্যে অপরিহার্য প্রভেদের সংকেত বলে ভাবা যায়।

অনুপাঠ। অনু- উপসর্গটার সুবিধা এই যে তা কালবাচক এবং ব্যাকরণের নিয়মেই পরবর্তিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য ভাষায় প্রচলিত ইনটারটেক্স্টুয়ালিটির (intertextuality) চেয়ে

সাময়িকতার ধারণাটা এই প্রয়োগে অনেক বেশি স্পষ্ট। *ঋতুরঙ্গশালায়* তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। শরৎ অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের নাট্যকাব্য। কিন্তু সেখানেও প্রস্তাবনার 'শরৎ' থেকে শুরু করে 'বিলাপ' পর্যন্ত ৫টি গান ও ৩টি আবৃত্তির মধ্যে ৩টি গান ও ৩টি আবৃত্তিই অনুপাঠের উদাহরণ বলে গণ্য হতে পারে।

শেষোক্ত এই ছ'টি অনুপাঠে মূল পাঠের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সাজানো হয়েছে তিন ধরণে। যথা—

(ক) এমন কোনো পাঠ যা *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডের অন্তর্গত নয়। পরবর্তী কোনো রচনা থেকে তা অনুপাঠে নটরাজের 'শরৎ' বলে সংকলিত হয়েছে। 'শান্তি'র প্রথম গান 'পাগল আজি আগল খোলে' *গীতবিতান*-এর 'প্রেম : প্রেম-বৈচিত্র্য' খণ্ডে, প্রকৃতি-খণ্ডে নয়।

(খ) বাকি আর দুটি গানে পাঠ-অনুপাঠের সম্বন্ধ আরেক ধরণের। উভয়েরই অনুপাঠকে সাজানো হয়েছে মূল পাঠেরই সঙ্গে সরাসরি উদ্ধৃতিতে। তবে একটু তফাৎ আছে। 'শরতের ধ্যান' অংশে 'আলোর অমল কমলখানি/কে ফুটালে' আর অনুপাঠ 'সেই তো তোমার পথের বঁধু' পাশাপাশি মুদ্রিত হয়েছে আলাদা আলাদা হরফে, যাতে বোঝা যায় প্রকৃতির জন্য লেখা এই দুটি গানের মধ্যে বাঁদিকের বড়ো হরফে যে মূল পাঠ আর ডানদিকের ছোটো হরফের অনুপাঠ একই বক্তব্যে সংপৃক্ত পারস্পরিকতার সূত্রে।

(গ) 'বিলাপ' অংশেও অনুরূপ উদ্ধৃতির ব্যবহার দেখা যায়, তবে পাঠ ও অনুপাঠ সেখানে আরো ওতপ্রোত সাজানো। 'চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি' প্রকৃতি-খণ্ডেরই নাম; তবে শরতের নয়, বসন্তের। মোট দশ লাইনের কবিতা। তার মধ্যে প্রথম দু'লাইন আর

একেবারে শেষ দশম লাইনটি বাদ দিয়ে বাকি গানটি নটরাজের জন্যেই লেখা। এই অংশটা যে শরতের জন্যেই রচিত তাও বোঝা যায় শেফালি, কাশ ও মালতীর উল্লেখ থেকে। এখানেও *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডের # ১৬৫ এবং প্রেম-খণ্ডের # ১৭৩-র মতন শরতের বিদায়-ব্যথায় মৃত্যুর আভাস লেগেছে : 'তোমার যে-আলোকে/অমৃত দিত চোখে,/স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।' ঋতুরঙ্গের অনির্দেশ্য নশ্বরতার স্মারক এই গানে পৃথক দুটি কবিতার টুকরো যে নিপুণ কারিগরিতে জোড়া লেগেছে তা যেন সহজে চোখে পড়ে না।

অনুপাঠের এই শিল্পে জোড়াতালির কাজ শরতের তিনটি আবৃত্তিতেই পাওয়া যায়। এগুলিও কবির নিজেরই রচনার উদ্ধৃতি, তবে অনুষঙ্গে যে-সব ভাবনা, ভাবচ্ছবি ও শব্দ তিনি অন্যত্র ব্যবহার করেছেন শরৎ প্রসঙ্গে, তাই কখনো সরাসরি কখনো সামান্য কিছু রদবদলে নাটকে ফিরে এসেছে সূত্রধারের কণ্ঠস্বরে। যেমন, গানে শরৎকে জানি ছুটির ঋতু বলে। মূর্তিমান অনির্দেশ্যতা, সে আর ঘরে ফিরবে না। পথে-পথেই সে মুক্তির দূত হয়ে বেড়াবে, এই তার প্রতিজ্ঞা। এখন, নটরাজের প্রস্তাবনায়, সেই অনুষঙ্গে, তার নির্ভুল পরিচয়—'আজ পথিকের দিন'।

তারপর দ্বিতীয় আবৃত্তিতে, বর্ষা ও হেমন্তের থেকে সমান দূরত্বে, ভরা-শরতের বর্ণনা *গীতবিতান*-এর প্রকৃতি-খণ্ডেরই অনুরূপ। সেই গানগুলির মতো এখানেও শরতের স্বভাব তার বহির্মুখিতা। নদীর ধারায়, ধানক্ষেতের বাতাসে, কাশের বনের শুভ্র আলোয়, শিউলি-ফোটা প্রকৃতির সর্বত্র 'বাজে ছুটির ঘড়ি'। শরৎ তেমনি 'পথের বাণী' শুনে পাগল। এখানেও 'পথ-ভোলানো বাঁশি' শুনে শরতের সঙ্গে নাট্যকার কবির সহমর্মিতা :

ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিত্তে
পথিকবন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোয়ানো সুরে।

শরতের বিদায়-কালে, তৃতীয় আবৃত্তিতেও, কয়েকটি কথা ও ছবি পাওয়া যায় গানের অনুপাঠে। ঋতুর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তারই আসন্নতায় অনির্দেশ্যে এখন ক্ষণস্থায়িত্ব ও নশ্বরতার সুরটাই প্রধান। শিউলি ও মালতী নিরাভরণ হয়ে সেই শেষ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঋতুটাকে মনে হয় যেন কেবলই আসা-যাওয়ার খেয়াল।

গীতবিতান-এর গানগুলির মতো এখানেও সেই অ-স্থিরতাকে ভাবা হচ্ছে বিরহের দুই প্রকার মনোবৃত্তিতে। একদিকে, যাবার বেলার হারাই-হারাই মনোভাব : 'সুদূর বিরহতাপে/বাতাসে কী যেন কাঁপে।' এমনই একটা মুহূর্ত যা ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্তরে তার ছায়ার উপমায় 'অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রুদ্ধ আকাশে বাজে'। আরেকটি গানে এরকমই আরেক বিদায়ক্ষণে শরৎ আকাশ ম্লান হয়ে এসেছিল, 'বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলছল' সেই মুহূর্তে আরো যদি কিছু বলার ছিল তা বলা হয়ে ওঠেনি। অনুপাঠে *গীতবিতান*-এর 'প্রেম : প্রেম-বৈচিত্র্য'র সে গানটি মূল পাঠের বিরহভাবনাকে আরো গাঢ়, আরো প্রসারিত করে তোলে।

গীতবিতান-এর গানে যাবার বেলার এই অনির্দেশ্যতায় যে দ্বৈধভাব ছিল তাও এ আবৃত্তির অনুপাঠে হারিয়ে যায়নি। শরতের স্বভাবই হলো আসা-যাওয়ার খেয়াল, যাতে মিলন-বিরহ দুই-ই আছে। তাই ভাবতে হয়, 'আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কি কেবলই খেলা'। শরৎ যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই 'প্রেম :

প্রেম-বৈচিত্র্য'-খণ্ড থেকেই—সে শুধু 'ক্ষণিকের অতিথি'। বর্ষার শেষে ঝরা শেফালির পথে সে 'মিলনছলে বিরহ' এনেছিল। এখন শরতের শেষে আবার সেই ঝরা শেফালির পথেই সে চলে যাচ্ছে হেমন্ত হয়ে শীতের দেশে। এ কি তাহলে 'বিরহছলে মিলন' আনার খেলা। সমর সেনের ব্যঙ্গোক্তি হয়তো কবির অনভিপ্রেত হয়নি?

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অনুপাঠে কবি নিজেই নিজের পাঠক। মূল পাঠের ওপর কবির মন্তব্যই সে-অনুপাঠ। মন্তব্যটা মূল্যবান এজন্যে যে তা তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই সাক্ষাৎকারের ফল, যা কার্যত আত্ম-অনুসন্ধান। এদিক থেকে গান ও নাটকের দুই রীতির পারস্পরিকতায় ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে কাজ করে অনুপাঠ নতুন এক মাত্রায়। গান ও নাটকের সম্বন্ধে কবিসত্তার ভূমিকা প্রধানত রচনা ও প্রযোজনা দিয়ে নির্দিষ্ট। মূল পাঠ ও অনুপাঠের সম্বন্ধে কবিসত্তার ভূমিকা প্রধানত রচনা ও সমালোচনা দিয়ে নির্দিষ্ট। উভয়েই কবির এক আমি তাঁর অন্য-আমি-র সঙ্গে নিজেকে-খোঁজার দ্বৈতলীলায় ব্যাপৃত। তবে নাটকের নিজস্ব দাবিতে সে অনুসন্ধান শিল্পিত হয় এক ভাবে। সমালোচনায় সহৃদয়তার দাবিতে তাকে দেখা যায় আরেক রূপে—অন্তরঙ্গতার আরেক মাত্রায়। দুই রীতির আলোচনায় অনুপাঠের সেই মাত্রা যোগ করে বাকি চারটি ঋতুকে কীভাবে ভাবা যায়, তা-ই এখন আমাদের আলোচ্য।

গীতবিতান-এর হেমন্ত

গীতবিতান-এ হেমন্তের একটা গভীর আত্মস্থ রূপ আছে। সে হেমন্তলক্ষ্মী—অন্নপূর্ণা, মাতৃমূর্তি। তার নিজের ভাণ্ডারে অভাব কিছু

নেই। 'ক্ষুধার্তজনশরণ্য' সে অপরের অভাব দূর করে নীরব অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। বন্দনা-সংগীত 'নমো, নমো, নমো' (প্রকৃতি : হেমন্ত # ১৭৫) থেকে এটাই তার কেন্দ্রীয় ধারণা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ এ ধারণার জোরেই তাকে নিষ্কেন্দ্রিক, অনির্দেশ্য শরৎ থেকে আলাদা করে অপেক্ষাকৃত বলবান ঋতুগুলির সঙ্গে এক পর্যায়ের বলে ভাবা সম্ভব বলে মনে হয়। এদের মতন হেমন্তেও কিছুটা অনির্দেশ্যতা আছে ঠিকই, কিন্তু কেন্দ্রীয় ধারণার তুলনায় তা দুর্বল।

এ সিদ্ধান্তটা কি ঋতুরঙ্গশালা-নটরাজেও খাটে? *গীতবিতান*-এর গানগুলি সেখানে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে দেখা যাক। প্রকৃতি/হেমন্ত অংশে মোট গানের সংখ্যা পাঁচ (# ১৭১-১৭৫)। নটরাজ-এ 'হেমন্তের প্রবেশ' থেকে 'দীপালি' পর্যন্ত মোট গানের সংখ্যা চার (# ১৬, ১৭, ১৮, ১৯) এবং আবৃত্তির সংখ্যা তিন (# ১৫, ১৬, ১৭)।

অনির্দেশ্যতার প্রশ্ন

গীতবিতান-এর পাঁচটি গানের মধ্যে যে দুটি গান নটরাজ থেকে বাদ পড়েছে তাদের দুটোই অনির্দেশ্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন, 'হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী' (প্রকৃতি/হেমন্ত # ১৭৩)। হেমন্তের পূর্ণিমায় বসন্তের নানা লক্ষণ দেখে মনে হয় 'কার মধুর স্মরণখানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি'। আবার, 'সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই' (প্রকৃতি/হেমন্ত # ১৭৪)। সে দিনটা ছিল শরৎ, 'তখনো খেলার বেলা'। কিন্তু এখন হেমন্ত : 'বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি/দিনশেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই।'

প্রতীক্ষার অনির্দেশ্যতা। হেমন্তে এখনো শরতের রেশ লেগে আছে।

এ দুটি গান যে বাদ দেওয়া হলো তার মানে কি এই যে নটরাজে অনির্দেশ্যতার কোনো স্থান নেই? তা যে নয় তা বোঝা যায় বাকি তিনটি গান থেকে। তিনটিই অনির্দেশ্যে আচ্ছন্ন। অতএব দেখা যাক আবৃত্তির অনুপাঠে এ বিষয়ে কী বলা হচ্ছে।

প্রথম দুই আবৃত্তিতে অনির্দেশ্যতাই নাট্যকারের মূল বক্তব্য। প্রথমটির বিষয় হেমন্তের বিহ্বলতা—'হেমন্তেরে বিভল করে কি-সে'। শরৎ থেকে শীতের উদ্দেশে চলতে চলতে সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। আলোক-উজ্জ্বল শরতের কথা তার আর মনে নেই, কণ্ঠ রুদ্ধ 'বিস্মৃতির বাষ্পে', চোখে জল। অনির্দেশ্যের ডাকে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়াই ছিল শরতের ধর্ম। কিন্তু অনির্দেশ্যতায় বিহ্বল হেমন্ত যেন কৃপার পাত্র। গৃহবধূদেরই কাছে অনুরোধ করতে হচ্ছে 'ক্ষণেক তরে লও-না ঘরে ডাকি'। কেননা, যে সুদূর হিমাচলে ওকে পৌঁছতে হবে সে তো অনেকটা পথ। ইতিমধ্যে ওর বাতি নিভে গেছে। অতএব, 'বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বাল/একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।' এরই সমর্থন শোনা য়ায় 'হিমের রাতে ওই গগনের/দীপগুলিরে' গানটিতে (যদিও 'আপন আলো' পদে দীপালিকা সেখানে অন্তর্মুখীও বটে)।

আবার, 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা' গানের ঠিক পরেই দ্বিতীয় আবৃত্তিতে ঠিক তারই সঙ্গে মিলিয়ে করুণার পাত্রী হেমন্তের বর্ণনা : 'হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা'। উভয়তই এই ঢাকাটা চুল বা চোখের ওপর ঢাকনাকে পরিণত করেছে নিজেকে গুটিয়ে রাখার উপমায়। গানের দ্বিতীয় লাইনের 'হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা' হয়তো তার শেষ লাইনের সঙ্গে

মিলিয়ে পড়া যায়—'আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা'। অন্তত পক্ষে, তেমনই যেন পড়া হয়েছে আবৃত্তির শেষ দু'লাইনে—'কেন বলো হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,/মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা।'

অবশ্য এই জটিলতা এড়িয়ে গানের দ্বিতীয় স্তবক, অর্থাৎ 'ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে' থেকে পঞ্চম লাইনটি পর্যন্ত সবটাই প্রথম স্তবকের হিম-গুণ্ঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে পড়াও সম্ভব। কেননা তাহলে বলা যায় যে ঋতু-বন্দনার অন্নদাত্রী রূপটা তার সঙ্গত এবং তৃতীয় আবৃত্তিটা কার্যত তারই অনুপাঠ। কবি ভেবে-চিন্তেই গানের দুই স্তবক পরপর দুটি আবৃত্তিতে সাজিয়েছেন।

কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যায় যে তার ফলে হেমন্ত সম্পর্কে দুটি প্রায় বিপরীত ধারণা পরিবেশন করা হয়। ঋতুটা একাধারেই যেন অনির্দেশ্যতার প্রতীক এবং সুনির্দিষ্ট কোনো মাতৃমূর্তির বর্ণনা। তা-ই যদি কবির অভিপ্রেত হয়ে থাকে তাহলে ভাবতে হয় এই দ্বিধাবিভক্ত রূপায়ণের তাৎপর্য কী? হেমন্তের বর্ণনায় কবি কি নিজেরই অন্তর্নিহিত কোনো দ্বিধা ও অনির্দেশ্যতাকে ভাষা দিলেন? হয়তো তাই। কারণ অল্প বয়েস থেকেই অনির্দেশ্যতা যে তাঁর স্বভাবগত তা নিজেই বলেছেন তিনি, এবং এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনাও করেছি।

কিন্তু এই সে জটিলতার একমাত্র দিক নয়। অনির্দেশ্যতারও প্রকারভেদ আছে। শরত ও হেমন্তের মধ্যে খুব বড়ো একটা তফাৎ এই যে শরতে অনির্দেশ্যের সুর আনন্দের, হেমন্তে বিষাদের। শরতে ছুটির বাঁশি বাজে, বাঁধনমুক্তির উল্লাসে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত, বাইরের আকর্ষণে মন ঘরে থাকতে চায় না। হেমন্তের সুর তার

ভাবমূর্তিরই অনুরূপ—দিগ্‌ভ্রষ্ট, কুহেলিকায় অস্পষ্ট, নিজেরই কুণ্ঠায় নিজেকে গোপন করে রাখা। প্রকৃতির এই দ্বিমাত্রিক অনির্দেশ্যতাও যেন কবিমানসেরই উপমা।

তাহলে হেমন্তের ধারণায় বৈপরীত্যের রূপে তিন প্রকার জটিলতা দেখা যাচ্ছে। সংক্ষেপে, খানিকটা ছক বেঁধে সাজিয়ে বলা যায়—

(ক) একদিকে তার অনির্দেশ্যতা, অন্যদিকে অন্নদাত্রী হেমন্তলক্ষ্মীর ভূমিকায় তার সুনির্দিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

(খ) তার অনির্দেশ্যতার দুই রূপ। (১) শরৎ-আলোর স্বচ্ছতার বিপরীতে তার কুয়াশা-ঢাকা আত্ম-গোপনতা, আর (২) শরতের আনন্দ-রূপের বিপরীতে তার বিষণ্ণতার রূপ।

এই তিন মাত্রার বৈপরীত্যে হেমন্তের ধারণা শরতের চেয়ে আরো কত বেশি জটিল মনে হয়।

গীতবিতান-এর শীত

গীতবিতান-এ শীতের গান বারোটি (# ১৭৬-১৮৭)। *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা*-য় গান এবং আবৃত্তি নিয়ে মোট আটটিতে তার নির্যাস থেকে চারটি গান বাদ পড়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল বক্তব্যের কোনো হানি হয়নি। কেননা ঐ গানগুলির বিষয় হয় হেমন্তের স্মৃতি কিংবা বসন্তের আগমনী যা গীতিনাট্যে বেশ ভালোভাবেই বলা হয়েছে শীতের কেন্দ্রীয় ধারণাটির বিপরীত সম্বন্ধে।

'নির্দয় অতি করুণা তোমার/বন্ধু তুমি হে নির্মম' : ঋতু-বন্দনার এই ক'টি কথাই সে কেন্দ্রীয় ভাবরূপের সম্যক বর্ণনা। এত নির্দয় সে বন্ধুত্ব যে মৃত্যুই তার যথাযথ উপমা। শীত যেন মৃত্যুর নৃত্যলীলা :

'নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়/মরণতালে।' (আবৃত্তি : নৃত্য) লীলা বলেই তা এক রকমের খেলাও বটে। 'শীতের উদ্‌বোধন'এ তাই আবৃত্তিতে বলা হচ্ছে—'ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,/শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু'।

খেলার কথা বলতেই মনে পড়ে হেমন্তের বিষণ্ণতা : তার হিম-মলিন ছায়ায় 'ভাবিয়াছিনু খেলার দিন/গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন'। কিন্তু এখন বুঝতে পারি সে শুধু 'ছলনাভরা খেলা' যার কেবল বাইরের দিকটাই ছিল কুয়াশার জালে বাঁধা, কিন্তু ভেতরটা ভেঙে গেছে নাচের তালে তালে। 'নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খান্‌খান্‌,/মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ'। অর্থাৎ মৃত্যুই এখানে প্রাণের উৎস। জড়তাকে পরাস্ত করে প্রাণশক্তির জয় ঘোষণাই মৃত্যুর বিপ্লব—

কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল পুষ্পের দুঃসাহস।

(আবৃত্তি : শীত)

এই শূন্যতাই নবজীবনের শর্ত। তাই মৃত্যুর কথা এ নাটকে বারবার শোনা যায় পরম শূন্যের উপমায়। (স্তব : গান) শূন্য বলেই মৃত্যুর অঞ্জলি অমৃতের ধারায় ভরে ওঠা সম্ভব। শূন্য মন : অতীতের আবর্জনা নেই বলেই তা নূতনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে 'বসন্তের কবি/শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি/লেখে আসি, সে-শূন্য তোমারি আয়োজন।' (আবৃত্তি : শীত)

এই প্রসঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে শূন্যতা এখানে দায়িত্বহীন

নেতির আস্ফালন নয়। এ খেলায় ফাঁকা ঘরগুলিতে কাটাকুটির চিহ্ন বসিয়েই রচনা করা হয়েছে নতুন এক মূল্যবোধের তালিকা। (আবৃত্তি : নৃত্য) আলস্য, ভয়, সংশয়, মিথ্যা শুচিতার ভণ্ডামি—এগুলিই সেই আবর্জনা যা সরিয়ে দিয়ে শীত তৈরি করেছে সম্ভাবনা, অর্থাৎ সেই ভবিষ্যৎ যার নাম বসন্ত।

কবিত্বও সে ভবিষ্যতের সঙ্গে তার সংগীতের সুর মিলিয়ে বলতে পারে, 'দক্ষিণবায়ে করে যাব দান/রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান, কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান/লতায় গাছে।' (আবৃত্তি : নৃত্য) প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদে কালিক সম্ভাবনার এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসন্তের কবি যে-শূন্যের ফাঁকায় পূর্ণতার ছবি আঁকছেন, সে-শূন্য তোমারি আয়োজন।' (আবৃত্তি : শীত)

গীতবিতান-এর বসন্ত

হেমন্ত আর বসন্ত, স্মৃতি ও সম্ভাবনা, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এদের মধ্যে ঋতুর রঙ্গক্ষেত্রে চরম অনির্দেশ্যের পথ শীত। সে পথে চলতে চলতে, অনুপাঠে, কখন আমরা পৌঁছে গেছি ঋতুচক্রের সেই বর্তমানে যা নবীনতারই নামান্তর। কী অর্থে তা নবীন?

এ বিষয়ে 'শীতের বিদায়' আবৃত্তিটি অবশ্যপাঠ্য মনে হয় আমাদের কাছে। কেননা যে-বিশেষ দিক থেকে বসন্তকে নতুন বলা যায়, ঠিক তারই উপর জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে শীতের উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করছেন। সে-ই নতুন রাজা, কিন্তু সে যে চপলচিত্ত। উদাসীন, কঠিন-হৃদয় শীতের কি এতটুকুও দুশ্চিন্তা নেই যে এই নবীনের হাতে রাজ্যের ভার ছেড়ে দিলে

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে।

সার কথাটা এই যে নতুন রাজার রাজত্বে শাসনের জায়গা নেবে মিলন—দণ্ড হবে বেণু; ক্ষমতার হুংকারের বদলে শোনা যাবে গানের সুর; যার গলায় কর্তৃপক্ষের সামনে ভয়ে কথাই ফুটত না তারই কণ্ঠ বিচিত্র কোলাহলে বাতাসকে ভরিয়ে দেবে; এতকাল বিবর্ণতাই ছিল নিয়ম, এখন নতুন আমলে 'নানা রঙ ফিরে এসে,/আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে/জাগাইবে মত্ততা।'

গীতিনাট্যে এর ঠিক পরেই 'বসন্তের প্রবেশ'। অথচ তার যে ছ'টা গান আর সাতটা আবৃত্তি তা মিলিয়ে পড়লে মনে হয় যে মিলনের উৎসবের চেয়ে অত্যাসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কাতেই যেন এই নতুন রাজত্ব বেশি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেই একই ভাব দেখা যায় *গীতবিতান*-এর বসন্তে। বস্তুত, গানে আর নাটকে, মূলপাঠে আর অনুপাঠে উভয়তই বসন্তের স্বভাব, নিঃসন্দেহে, তার ক্ষণিকতা।

তবে, রবীন্দ্রনাথের চোখে সব ক্ষণিকই এক ধরণের নয়। শরতের ক্ষণিকও সে ঋতুর স্বভাবগত। কিন্তু তা নশ্বরতার চরম নিদর্শন মৃত্যুরই বিশেষ এক রূপ। বসন্তের ক্ষণিকতা নশ্বরতার নয়, বিচ্ছেদের।

গীতবিতান-এর বসন্ত-বর্ণনা একেবারে গোড়া থেকে বিষণ্ণতায় ভরা। বসন্তের শুরু হচ্ছে এখানে তিনটি আবাহনী সংগীত দিয়ে (# ১৮৮-১৯০) যা নবীনতারই বন্দনা। তার প্রথমটিতেই (# ১৮৯) সে যৌবনবেগে সুন্দর, নবতেজে দৃপ্ত বীরের ভঙ্গিতে উপস্থিত। অথচ এই

তেজের লেশমাত্র চিহ্ন নেই অন্য কোথাও তার চরিত্রায়ণে। প্রায় সর্বত্রই সে কেমন যেন খামখেয়ালি আগন্তুক যে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফিরে যেতে চায়—'ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায় হায় হায়/তারপরে তার যাবার বেলা, হায় হায় হায়'। (# ২১৩) এ শুধু 'খেলা ভাঙার খেলা'। (# ২৩১)

প্রকৃতির খেলা। বসন্তের সঙ্গে বনস্থলীতে ফুল পাতা দক্ষিণ হাওয়ার খেলা। এরা সকলেই বসন্তকে চেনে। সে যখন 'পথভোলা পথিক' বলে নিজের পরিচয় দেয় (# ২০১), তখন তারা স্পষ্টই শুনিয়ে দিতে পারে—'পথিক, তোমায় আছে জানা', আজ সাজিভরে শিরীষ বকুল আমের মুকুল ইত্যাদি এনেছ বটে, কিন্তু 'কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে'। (# ১৯১) মিথ্যা অনুযোগ নয়ই বরং তা ঋতুচক্রের দাগে দাগে চিহ্নিত অভিজ্ঞতারই বর্ণনা—

তুমি আপনি যখন আস তখন আপনি কর ঠাঁই—
আপনি কুসুম ফোটাও, মোরা তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও চলে যাও সব আয়োজন হয় যে উধাও—
গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়, তাকাই অশ্রুনীরে॥ (# ২২৭)

ফুলেরাই এ বিষয়ে সবচেয়ে সোচ্চার। কারণ বসন্তে বসন্তে ফোটা ও ঝরে যাওয়ার করুণ ইতিবৃত্তের নায়িকা তারাই। তাই 'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন-দিনের স্রোতে/এসে হেসেই বলে, যাই যাই যাই'। (# ২৬১) কিন্তু এটা তো 'কাঁদন-ভরা হাসি'। (# ২০১) উতলা বসন্তের সঙ্গে সায় দিয়ে এইরকম এসেই-চলে-যাওয়ার প্রতিবাদে মুখর বনভূমি থেকে এখনও শোনা যায়, 'না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।/মিলনপিয়াসী মোরা।' এখনও বকুলের ফুল-ফোটানো শেষ হয়নি, সাজি ভরেনি—'পথিক ওগো, থাকো থাকো।' (# ২২৯)

বসন্ত-বিদায়ের এ কাহিনীটা অসমাপ্ত। একদিকে চলে যাবার তাড়া, আরেক দিকে তাকে আরো কিছুক্ষণ আঁকড়ে থাকার চেষ্টা—'এখনো বনের গান, বন্ধু, হয় নি তো অবসান—/তবু এখনি যাবে কি চলি' (# ২৪৯)— এ দোটানায় বসন্তের ক্ষণিকতাকে অনির্দেশ্যেরই বিশেষ এক অবস্থা বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু এ-ঋতুর যে-দিকটা ঝরে-পড়ার, তাতে অনির্দিষ্ট কিছু নেই। বসন্ত সেদিক থেকে 'শুক্‌নো-পাতা-ঝরা'র সময়। (# ১৯৬)

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুক্‌নো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে।। (# ২০৩)

এভাবে দেখলে বসন্তের প্রকৃতি আরো জটিল মনে হয়। তার স্বভাবগত ক্ষয়-ক্ষতির দিকটাও ফুল-ফোটানোর মতই সত্য বলে বোধ হয়—যে-কথা নটরাজের অনুপাঠে বেশ স্পষ্ট বলা হয়েছে। ফাল্গুনের শুরুতে নবীনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাই কবিকে লিখতে হয়, 'ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত।' (# ২৬৪) তাঁর চোখে ও চিন্তায় দৃশ্যটা তেমন নতুন নয়। ফাল্গুন ১৩২৮ তারিখে লেখা এ লাইনটিকে ছত্রিশ বছর আগে লেখা একটি গানে (# ২৭৮) 'শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়' লাইনটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও জীবনদর্শনে ফোটা ফুল ও শুকনো-পাতা একই ডায়ালেক্‌টিকের অঙ্গ।

ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।।
বসন্তগান পাখিরা গায়, বাতাসে তার সুর ঝরে যায়—
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিণীরে।। (# ২১৫)

গীতবিতান-এর বসন্ত শেষ হচ্ছে তাই সেই বিখ্যাত গান

(#২৮৩) দিয়ে—'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে'। কবি ফাল্গুনের 'বিদায়মন্ত্র' পেয়েছেন। ঝরা পাতা তখন বাসন্তী রঙের 'শেষের বেশে' সেজে হোলি খেলতে নেমেছে ধুলায় ঘাসে ঘাসে। বসন্তের সেই 'চরম ইতিহাসে' কবির কাম্য শুধু একটুখানি আগুন-রঙা আশা যে তাঁরও উত্তরীয় হয়তো সে রঙে রঙিন হয়ে উঠবে।

'ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে।' বিদায় শব্দটা একাধিকবার শোনা গেছে *গীতবিতান*-এর বসন্তে। 'এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো, ও চাঁপা ও করবী!/তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।' (# ২৩০) কিংবা, 'বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে/তোমায় ডাকব না তো ফিরে।' (# ২২৭) বোঝা যাচ্ছে যে একটা কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তা কী ধরনের শেষ, তার মেয়াদ কতটা? কথাটা ওঠে এজন্যে যে আমরা দেখেছি বসন্ত যখন ফিরে আসে এবং ফুল ফোটায় তখন, যারা তাকে বিদায় দিয়েছিল তারাই তা দিয়ে ডালা সাজায়। (# ২২৭) আর বসন্ত নিজেই স্বীকার করে যে সে বিদায় নিয়ে যায় বটে, কিন্তু ফিরে ফিরে আসে : 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।/ভেবেছিলেম ফিরব না রে॥/এই তো আবার নবীন বেশে/এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে॥' (# ২৭৫)

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই শেষটা চরম শেষ কিছু নয়। আসলে এ-বিদায়টা এক রকমের বিচ্ছেদ, যেখানে দুপক্ষই অমোঘ বাৎসরিক নিয়মে পরস্পরকে বিদায় দেয় এবং মিলিত হয়। এই বিচ্ছেদ তাই অভ্যাসগত, অনিবার্য এবং প্রকৃতির সব কিছুর মতোই স্বাভাবিক। বিচ্ছেদ বললেই বোঝায় প্রতীক্ষার কাল তাই এখানে বিদায় বলতে বোঝাচ্ছে প্রতীক্ষার সেই সব যতিচিহ্ন যা কখনো দেখা দেয়

মিলনে, কখনো বা বিরহে—এবং সর্বদাই যা ফিরে ফিরে আসে। ঋতুচক্রের আবর্তনে নিয়ম-বাঁধা প্রত্যাবর্তনই তার মর্মকথা।

প্রত্যাবর্তন

অনেক আদিম সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ঋতুচক্রের এই নিয়মনিষ্ঠা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে গণ্য হয়ে থাকে। সব রকমের শুরুর মতো বছরের শুরুটাও নানাবিধ তাৎপর্যে ভরা। মির্সিয়া এলিয়াদে-র *দ্ মিথ্ অব দ্ ইটার্নাল রিটার্ন* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেকেরই পড়া আছে।[১] তার মধ্যে যে ক'টি কথা আমাদের এই জিজ্ঞাসায় প্রাসঙ্গিক, সেগুলি নজরে রেখে আমরা দেখাতে চাই যে গানে ও নাটকে, পাঠে ও অনুপাঠে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় প্রকৃতি ও মানুষের আস্তিত্বিক সম্বন্ধটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। সম্বন্ধটা আস্তিত্বিক এই অর্থে যে তা কালিক, দৈশিক নয়। ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক বা বহির্বিষয়ক দেশগত অবস্থানের দ্বারা নির্ণীত নয় বলেই এক্ষেত্রে মানবসত্তার কেবল সেই দিকটাই বিবেচ্য যে-দিকে তা সম্পূর্ণই অন্তর্মুখীন, অতএব কালিক।

কালিকতাকে এখানে তিনভাবে রূপায়িত দেখা যায়। প্রথমত, নবীনতায়। ঋতুর বিধানে সব দেশেই নতুন বছরের আরম্ভ সেই নবীনে যা আবার ফিরে আসবেই। সুতরাং শুরু আর তার অবশ্যম্ভাবী শেষ যে-ফেরা তার অন্তর্বর্তী সব আরম্ভই বলা যায় নবীন। কিন্তু তা

নবীন কেবল মেটনিমি বা সান্নিধ্যের টানে, হয়তো কিছুটা অতিব্যাপ্তিতেই। অতএব তার এই সাংবাৎসরিক নবীনতায় বিস্ময় বা আবিষ্কারের চেয়ে প্রকৃতির বিধানসংগত শাসনের দিকটাই যে বেশি চোখে পড়ে সেকথা *ঋতুরঙ্গশালা*-র অনুপাঠে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সেই শাসনকে শাশ্বত প্রত্যাবর্তনের অনুশাসন থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়ত, শাসন থাকলেই তা কঠোরতা থেকে অবিচ্ছেদ্য, কারণ সব শাসকই দণ্ডধর। *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা*-র নবীন রাজা বসন্তও তাই। সব আদিম সংস্কৃতিতে তাই প্রত্যাবর্তনকে শুদ্ধিযোগের উৎসব বলে ভাবা হয়। এলিয়াদে তাঁর গ্রন্থে নানা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যের সংকলনে দেখিয়েছেন কী ভাবে অনেক দেশেই নতুন বছরের শুরুতেই কয়েকটা দিনের নানা অনুষ্ঠানে বিগত বছরের পাপক্ষয়কে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় : কোথাও তা স্বীকারোক্তি, কোথাও তা উপবাস, কোথাও-বা আগামী বছরের কল্যাণ কামনায় তাকে পাপের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদ লোকাচারের রূপে দেখা যায়।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক নিয়মকে এইভাবে মানুষের মঙ্গলে নিয়োগ করার চেষ্টা যে ইতিহাসের নিয়মবিরুদ্ধ, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ইতিহাসে সময়ের ধারা সর্বদাই সম্মুখগামী। কদাচিৎ যে আবর্তের সৃষ্টি হয় জলে তাও শেষ পর্যন্ত ধারাস্রোতে মিলিয়ে চলতে থাকে। তাই বছরের গোড়া থেকেই গোটা বারোমাসকে ঋতুচক্রের এক পাক আবর্তনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে ইতিহাসের সময় চুরি হয়।

প্রাকৃতিক আর ঐতিহাসিকের এই বিরোধিতা দুপক্ষেই ধর্মমত ও ধর্মনিষ্ঠ লোকাচারের প্রশ্রয় পেয়েছে। খৃষ্টপূর্ব সব ধর্মই এ বিষয়ে

প্রাকৃতিকের পক্ষপাতী, আর খৃষ্টযুগ থেকে সেই ধর্মমতে ঐতিহাসিক-তাই প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম থেকে আচারে ও অনুষ্ঠানে নববর্ষ উপলক্ষে আদিম সংস্কৃতির প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। বরং বছরের প্রথম দিনটির এক সপ্তাহ আগে থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহ কাল আজও ইউরোপের নানা দেশে প্রত্যাবর্তনের উৎসব বলে প্রচলিত। এ বিষয়ে মির্সিয়া এলিয়াদে তাঁর গ্রন্থে অনেক তথ্য সংকলন করেছেন। তারই ভিত্তিতে তিনি মনে করেন যে প্রত্যাবর্তনের ধারণাটা খৃষ্টীয় ধর্মের বিশ্বাসে ও ব্যবহারে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, তাঁর মতে আধুনিক ইতিহাস-চিন্তাও এ ধারণার দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে। খৃষ্টোত্তর ইউরোপে এবং ইউরোপের বাইরে নানা দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সূত্রে সর্বত্রই অতীতের অনুকীর্তনে ইতিহাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠেছে। মূল যে historicist (হিস্টরিসিস্ট) শব্দটিকে আমরা বাংলায় ইতিহাসবাদী বলে তর্জমা করে নিচ্ছি, তার উৎপত্তি খৃষ্টীয় ইউরোপে। আঠারো শতকের আলোকযুগ থেকে সেখানে অতীতকে মহাত্মা যিশুর জীবন-বৃত্তান্তের আদর্শে ভাবা প্রায় অভ্যাসগত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উনিশ শতক থেকে হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবে তা ইতিহাসবাদকে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণগুলির অন্যতম বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ, এলিয়াদে লক্ষ করেছেন যে সেই আধুনিকতার দুই প্রবক্তা টি. এস. এলিয়ট এবং জেম্‌স জয়েস যাঁরা দুজনেই গভীর ভাবে খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী, তাঁরা উভয়েই তাঁদের রচনায় শাশ্বত প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী। অতএব সংগতভাবেই ভাবা যায় যে প্রত্যাবর্তনের সুপ্রাচীন ধারণার সঙ্গে ইতিহাসবাদী আধুনিকতার কোনো মৌলিক বিরোধ নেই।

নৃত্যছন্দ ও তার দোলা

পাশ্চাত্যে যেমন এলিয়ট ও জয়েস, তেমনি রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষে আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের অন্যতম। তিনিও একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। ইউরোপের উদারপন্থী ইতিহাস-চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে তাঁর অতীত-সমীক্ষায় তিনিও সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসবাদী। বসন্ত-বর্ণনায় প্রত্যাবর্তনের ধারণা তিনিও বর্জন করেন নি। তাঁর কাব্যে বসন্তের যাওয়া-আসা এবং বনে বনে, আকাশে, বাতাসে তার সাড়া জাগাবার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রত্যাবর্তনেরই নিয়মে।

ছন্দটা নাচের। ঋতুচক্রের বাৎসরিক আবর্তনে সে-নাচ রূপায়িত হয় নটরাজের তাণ্ডবে। এই তাণ্ডবেই রচিত হয়, একদিকে, বহিরাকাশে ষড় ঋতুর ফিরে-ফিরে আসার নাটক, আর অপরদিকে, অন্তরাকাশে সেই ফিরে আসার গান। *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা*-য় সে পালাগানের মর্ম কী তা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে দুই পদক্ষেপে জগতে ও জীবনে রূপলোক ও রসলোকের এই সৃষ্টিতে যোগ দিলে 'লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়'। সেই মুক্তিতেই কবিত্বের চরম স্বাধীনতা। কবি তাই নিজেকে মনে করেন 'নটরাজের চেলা' (আবৃত্তি : 'মুক্তিতত্ত্ব'), তার 'কবিশিষ্য' (আবৃত্তি : 'উদ্‌বোধন')।

সব ছন্দের মতো মহাকালের এই নৃত্যচ্ছন্দেরও একটা দোলা আছে। *গীতবিতান*-এর 'বসন্ত'এ বাইরে ও ভেতরে এই দোলার বর্ণনা থেকে প্রত্যাবর্তনের 'চক্রক আন্দোলন' (এলিয়াদের ভাষায়, cyclical undulation) সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায় কিনা দেখা যাক।

গীতবিতান-এ বসন্তের আবাহন হচ্ছে ১৮৮৮তে লেখা *মায়ার খেলা*-র একটি গান দিয়ে—''এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে।/... আন'

আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।/ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল।' (#১৮৯) ১৯২৬ সালে সেই বক্তব্যই আবার লেখা হবে *নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা*-র আবৃত্তি 'মুক্তিতত্ত্ব'এ। নটরাজের নাচের ছন্দে মিলিয়ে এই বাঁধন-ভাঙার গানই আগাগোড়া গাওয়া হবে *গীতবিতান*-এর বসন্তে। দখিন-হাওয়া, যা পথিক হাওয়া (# ২০৪), তাকে সম্বোধন করে শুরু হতেই শোনা যাবে, 'ওগো পথিক বাঁধন-হারা,/নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তি-দোলা করে যে দান/.../বন্ধ ভাঙার ছন্দে আমার মৌন-কাঁদন হয় অবসান।' (# ২১৮)

তাণ্ডবের দুই পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই মুক্তি-দোলার ছন্দে বহিরাকাশে যতটা সাড়া জাগায়, অন্তরাকাশেও ততখানি। বাইরে, প্রকৃতিতে, সর্বত্রই বসন্ত অবারিত-দ্বার : 'ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।/স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।' (# ১৯৭) দক্ষিণ বাতাসে তার দৌত্য যা সবকিছুকে দোদুল দোলায় দুলিয়ে দেয় (# ২০৪)। 'আজ ভুবনের দুয়ার খোলা, দোল দিয়েছে বনের দোলা—/দে দোল! দে দোল! দে দোল!' (# ২৩৬) ডালে ডালে নব পল্লবদলের—নতুন পাতার, নবীন কিশলয়ের দোল তাদের অকারণ চাঞ্চল্যে, তাদের নাচে নাচে। (# ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮) এমনকী শুক্লপক্ষের যে চাঁদ, তিথির পর তিথিতে একে একে পাড়ি দিচ্ছে যার ডিঙি, তাও যেন চলছে 'দোলের নাটে'। (# ২৪২)

চাঁদের ছবিটা একই সঙ্গে গার্হস্থ্য ও মহাজাগতিক। 'ও চাঁদ, তোমায় দোলা—/কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা—'। (# ২২৩) দোলনার মৃদু ছন্দে অপত্যস্নেহের এই দোলায় সাড়া দিয়েই 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা,/বুকের পরে দোলে দোলে দোলে দোলে রে, তার পরানপুতলা।' (# ২৫৪) কিন্তু মা ও সন্তানের দোল-দোল

খেলার এই স্বল্প-পরিসর পারিবারিক চিত্রের ফ্রেম বিশ্বজোড়া, তাই তা আন্দোলিত হয় 'বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে'। (# ২২৩)

এই বিশ্বটা কেবল মহাকাশও নয় বা গৃহাঙ্গনও নয়। তার স্থান বহিরাকাশ ও অন্তরাকাশের প্রতিচ্ছেদে, যেখানে বাহিরে বলতে বোঝায় অন্তরে এবং অন্তরে বলতে বোঝায় বাহিরে। বোঝার এই অর্থে যে এ যুগ্মকের একটি রাশি বাদ দিয়ে অপরটিকে ধারণাভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই চাঁদের দোলাকে ভাবতে হয় 'মানসের সরোবরে' কোনো মাধুরীর দোলার সঙ্গে মিলিয়ে (# ২২৩), তাই বসন্তে ধরিত্রীর অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত হয় 'আমার হৃদয়দোলায়'। (# ২৫৪)

অন্তরে-বাহিরে এই স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যায় বসন্তের আর একটি গানে—

বেদনা কী ভাষায় রে
  মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
  চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।। (# ২৪৬)

প্রকৃতিতে যে দখিন হাওয়ার সঞ্চরণ হয় বসন্তে, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু সে প্রাকৃতিক এখন বেদনা হয়ে অন্তর্লীন মানসিকতার গুঞ্জরন। রূপলোক ও রসলোক অন্বিত হয়েছে বেদনায়। আকাশে বাতাসে বনভূমিতে যে-আন্দোলন, তা-ই বিশ্ব-দোলায় অনুকীর্তিত হচ্ছে বেদনার ভাষায়।

বসন্তে-বসন্তে সেই ভাষায় কবিকেও সাড়া দিতে হয়। সে জানে যে প্রাকৃতিক নিয়মে তা অনিবার্য এবং অভ্যাসগত হলেও প্রতি বসন্তেই তা বেদনায় উৎক্রান্ত হয়ে পৌঁছে যায় সেই ঘাটে যেখানে নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিয়ে কবি নিজেকে রসসৃষ্টির সহকারী বলে

গণ্য করতে পারে। প্রত্যাবর্তনের প্রাচীন ধারণায় সে যে কেবল তার আধুনিকতা এবং ইতিহাস-চেতনার সমর্থন খুঁজে পেয়েছে তা নয়। আরো বড়ো কথা এই যে তারই আশ্বাসে কবিত্ব ফিরে এসেছে আত্মসচেতন স্বধর্মে।

গীতবিতান-এর গ্রীষ্ম

গীতবিতান-এর 'বসন্ত'এর শেষে দেখা গেল যে ঋতুচক্রের বাৎসরিক নিয়মে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেয়ে কবি সন্তুষ্ট বোধ করছেন। কেননা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার যে চরিতার্থতা তা-ই কবিসত্তার চরম পুরস্কার। *গীতবিতান*-এর 'গ্রীষ্ম'এও সে পুরস্কার কবি পেতে পারতেন হাত বাড়ালেই। কিন্তু ঋতুরঙ্গশালার নাট্যকার হিসেবে তিনি যেন জেনেশুনেই তা নিতে রাজি হননি।

কারণ হয়তো এই যে *গীতবিতান*-এর সংকলনে গ্রীষ্মের ধারণায় তিনি কিছু সমস্যা দেখেছিলেন। গানের পর গানে গ্রীষ্মের যে-রূপ সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিতান্ত কঠোর; তাই প্রশ্ন ওঠে যে ঠিক তার পরেই তাহলে বর্ষার কোমলতা হঠাৎ এসে পড়ল কোত্থেকে? এর কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা *গীতবিতান*-এ পাওয়া যায় না, যদিও তার সব উপাদানই সে গ্রন্থে আছে। নটরাজের অনুপাঠে সেই ব্যাখ্যাই নাট্যকার তাঁর দায়িত্ব বলে বিবেচনা করেছেন।

নাচ গান ও আবৃত্তি মিলিয়ে ন'টি রচনায় সে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কঠোর ও কোমলের মধ্যে এমনই একটা সেতু তৈরি করা যে এদিক থেকে ওদিকে পৌঁছবার পথে যুক্তির বিচারে কোনো ফাঁক থেকে না যায়।

কঠোর থেকে কোমলে রূপান্তরণ *গীতবিতান*-এ যতটা আকস্মিক মনে হয়, নটরাজে ততটা নয়। কার্যকারণের পরম্পরায় প্রকৃতির স্বভাবগত বিবর্তনের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই।

গীতবিতান-এর মতন গীতিনাট্যেও গ্রীষ্মের কঠোরতা সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছে। গোড়াতেই 'ঋতুনৃত্য-বৈশাখ'এ গ্রীষ্মের রূপ যতটা ক্রূর ও কঠিন হওয়া সম্ভব, ঠিক তাই পাওয়া যায়। ধ্যানস্থ, নিশ্চল-চিত্ত ঔদাসীন্যের প্রতিমূর্তি সে। বিশ্বব্যাপী রিক্ততা, হাহাকার, রসহীন নির্জীবতা, নির্মেঘ আকাশ, নির্দয় বায়ু— কোনো কিছুতেই তার ধ্যান ভাঙাতে পারে না। 'ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি/জড়দানবের ভৃত্য'।

সেই একই সভয় বর্ণনা ঋতুর 'সম্বোধন'এও : 'ধূসরবসন, হে বৈশাখ,/রক্তলোচন, হে নির্বাক,/শুষ্কপথের দানব দস্যু,/শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু।' অথচ, কলমের কালি শুকোতে না শুকোতেই 'বৈশাখ-আবাহন'এর গানে তারই অকুণ্ঠ স্তুতি-বন্দনা : 'তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে/বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।'

পুরাতন স্মৃতি, গান, অশ্রুবাষ্প—সবই যেন কোমল ভাবালুতা—সব দূর হোক, 'রসের আবেশরাশি শুষ্ক করে দাও আসি', আর মেঘ বা ছায়া বা জলের পরিবর্তে প্রার্থনা : 'অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।' এ কি আন্তরিক আবেদন, না নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়ায় ভীত কাতর প্রশস্তি তা স্পষ্ট নয়। তবে, প্রারম্ভিক এই চারটি নাচ গান আবৃত্তিতে গ্রীষ্মের নির্মমতাই যে নটরাজ-গীতিনাট্যের বিষয় তা নিঃসন্দেহ।

সুরে ও মেজাজে বাকি নাটকের সবটাই তার বিপরীত। সে বৈপরীত্য যে কবির নিজের অভিপ্রেত তা নিয়েও ভুল বোঝার অবকাশ কম। 'সম্বোধন'এর গানেই গ্রীষ্মের শুষ্কতা, উত্তাপ ইত্যাদি যা

কিছু ভয়াবহ তা উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলা হচ্ছে যে 'মোহন এল ভীষণ বেশে'— বৈশাখী ঝড়ের ভীষণতা যা আসল 'বেড়া ভাঙার মাতন'। ঠিক তার পরেই আবৃত্তিতে ও গানে বিশদ ব্যাখ্যায় বোঝানো হয়েছে কী অর্থে ভীষণই মোহন এবং কী অর্থে তার আগমনকে বলা যায় বেড়া ভাঙার মাতন। সেই ব্যাখ্যায়ই পরপর তিন ধাপ, তিন শিরোনামায়—'কালবৈশাখী', 'মাধুরীর ধ্যান' ও 'ব্যঞ্জনা'। উদ্দেশ্য, তিন ধাপ যুক্তিতে দেখানো কী করে গ্রীষ্মের কঠোরতা পরিণত হয়েছে তার কোমলতায়।

প্রথমেই 'কালবৈশাখী'। বৈশাখ এলেই কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু এ কেবল নৈসর্গিক নিয়মের ঝড় নয়। হৃদয়েরও ঝড়। গ্রীষ্মের শুরু হতেই বলা হয়েছে—'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে'। অর্থাৎ নটরাজের এই আবৃত্তিতে কালবৈশাখী অন্তর্লোকের হৃদয়বাসিনী ভাবমূর্তি। তাপস গ্রীষ্মের লীলাসঙ্গিনী সে। তার উপস্থিতিতে ভাবের আবেগ ভরে ওঠে প্রাকৃতিকের উপমায়—ঝঞ্ঝার ঝংকারে অন্তরে চাঞ্চল্য জাগে, মেঘের মন্ত্রে শোনা যায় গ্রীষ্ম-সন্ন্যাসীর ডমরু, সন্ধ্যারবির রঙে গেরুয়া হয় তার পতাকা, বনে বনে শাখায় শাখায় শোনা যায় খঞ্জনির বাদ্য। এক কথায়, কালবৈশাখীই গ্রীষ্মের তপোভঙ্গের মন্ত্রণা, কঠোরতা থেকে কোমলতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ বেড়া-ভাঙার যাত্রায়।

তারপর, গানে ও আবৃত্তিতে 'মাধুরীর ধ্যান'। এ নাটকের প্রথম অঙ্কে সংসার-বিরাগী তপস্বীর ধ্যান শুচিতা বা রিক্ততা বা যা নিয়েই হোক, তা যে মাধুরীর ধ্যান নয় তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। তাই 'মাধুরীর ধ্যান' শিরোনামা থেকে বোঝা যায় যে দ্বিতীয় অঙ্কের

গ্রীষ্মে উদাসীনতা এখন আর অনুভূতি-বিহীন নয়। তাই মধ্যদিনে একাকী বেণুর সুরে সাড়া দিয়ে সে তাপস 'মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি'। হঠাৎ তারই বিরহী-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আকাশ ভরে ওঠে, মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারে কালবৈশাখীর আসন্নতা জানায়।

হয়তো সেজন্যেই আবৃত্তিতে মাধুরীর ধ্যানকে সহজেই বলা সম্ভব হয়, 'পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি,/জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী'। তারই ধ্যান, এ-ব্যাখ্যায়, সুদূর পথে যার চরণধ্বনি শোনা যায়, যার কাঁকনের শব্দ তপোবনেও পৌঁছে যায় চপল হাওয়ায়। মাধুরীর ছোঁয়ায় কঠোর এখন স্পষ্টতই পরাভূত হয়েছে কোমলের কাছে, সংসার-নির্লিপ্ত শুষ্কতা পরিণত হয়েছে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মাধুর্যে।

শেষ আবৃত্তিতে কোমল-কঠোরের এই দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ ব্যঞ্জনা বলে অভিহিত হয়েছে। ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় শুধু তখনই যখন দুই হৃদয়ের মধ্যে বেদনার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সে সম্পর্ক কী করে গড়ে উঠেছে—রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মধ্যেই মাধুরীর ধ্যান; 'তাপিত আকাশে/হঠাৎ নীরবে চলে আসে/একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা'; অকস্মাৎ কোমলের স্পর্শে শান্ত চিত্তেও 'অহেতু উদ্‌বেগে/ভ্রুকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে'; বৈশাখী সন্ধ্যায় ঝড়ের দামামা বাজে, 'ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন'। প্রকৃতিকে মানুষ তার আপনার করে নিয়েছে বেদনায়।

গীতবিতান-এর 'গ্রীষ্ম'কে এই বেদনার ডায়ালেক্‌টিকে বোধগম্য করার জন্য গীতিনাট্যের কৌশলে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। তার যুক্তিবন্ধে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধের একটা দিক তদনুযায়ী বলা হয়েছে। তবে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে কবিসত্তার স্থান ঠিক কোথায় তা

নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা আলোচনা নেই এ ব্যাখ্যায়, 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক'—গানে যেমন ছিল নটরাজ—'বসন্ত'র শেষ গানটিতে। *গীতবিতান*-এর 'গ্রীষ্মে'ও তেমনি একটি গান (#১৮) আছে যা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি।

প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে,
'খোলো খোলো খোলো দ্বার।'
বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বানরবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার॥
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্ম্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।
আজি সারা দিন ধ'রে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার॥

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, ইং ১৯২২

সমস্ত গানটাই অনির্দেশ্যের আবেশে জড়ানো। যাত্রা শুরু হয়েছিল একটা আহ্বানে সাড়া দিয়ে, কিন্তু কার আহ্বান ঠিক জানা নেই। কেবল এটুকুই জোর করে বলা যায় যে অনেক আগেই, 'কবে' সেই প্রভাতে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। অথচ এখন সারাদিন রোদ্দুরে তেতে-পুড়ে দীর্ঘ পথের একমাত্র উদ্দিষ্ট যে মন্দির সেখানে পৌঁছেও বোঝা যাচ্ছে না 'কে আছে কিনা'। কেউ দরজা খুলছে না, সাড়া দিচ্ছে না। তাই 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা'।

অনির্দেশ্যতার মধ্যে সাধারণত কোনো-না-কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশার চাপ থাকে। এক্ষেত্রেও ছিল, ফলে সারা পথ প্রাণে সুর ভরে উঠেছে এবং এখন সমস্যা সে গান নিয়ে কী করা যায়। কিন্তু সেই

সমস্যায় আসার আগেই ভাবা দরকার কবি কী বলতে চাইছেন যখন তিনি লেখেন—'আজি সারা দিন ধ'রে প্রাণে সুর ওঠে ভরে'।

প্রাণে সুর ওঠে ভরে

পরপর এ চারটি শব্দ শুনলেই মনে হতে পারে—এ কেমন কথা? যার প্রাণে সুর ভরে উঠছে তার যেন কিছু করার নেই এ ব্যাপারে সুরটাই যেন নিজে নিজে ভরে উঠছে। সুরটা কি তাহলে স্বয়ংক্রিয় এবং আপনা থেকেই উৎসারিত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তিতে? এই ধরণের আত্মস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রকাব্যে বিরল নয়। তাই ১৯১৫ সালের রচনা, 'কাল রাতের বেলা গান এর মোর মনে' (গান : ৪১৮) যেমন সেই স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা, তেমনি পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে লেখা 'আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে' (গান : ৭২৪) আত্মস্থতায় অটল। উভয়তই কবির পরিবর্তে কবিতার অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব।

কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, হয়তো সব কবিত্বের ইতিহাসেই কবিতা এইভাবে কবির মন হরণ করে নেয়। এক সময় ছিল যখন এই ঘটনার অভাবনীয়তায় কবি আধ্যাত্মিক রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন নিজের সৃষ্টি থেকে। যেমন, মঙ্গলকাব্যে যেখানে কাব্যরচনাই স্বপ্নাদেশ, যেখানে কবি যন্ত্র দেবী যন্ত্রী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তীরা, যাঁরা পৃথিবীর কবি, তাঁরা এই ঐতরিকতার শিকার হননি। গান যে স্বয়ংক্রিয় হয়ে 'এল মোর মনে' বা 'আমার মন হরণ করে' কিংবা সুরে যে প্রাণ ভরে ওঠে, তাকে তাঁরা সংসারের মধ্যেই কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত উৎক্রান্তি বলে বিবেচনা করেন।

অবশ্য আধুনিকতার প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তির আধ্যাত্মিক লেজটুকু খসে পড়েছে বলেই সহৃদয় পাঠকের পক্ষে তার রহস্য সম্পর্কে উদাসীন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা স্বতঃস্ফূর্তিও একরকম জ্ঞান যে-বিষয়ে অনবহিত হলে কবিতার রস থেকেই সে বঞ্চিত হবে। তাই ইমানুয়েল কান্টের ক্রিটিকে আধুনিকতার সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার আলোকে আমরা স্বতঃস্ফূর্তি কী তা বুঝতে চাই।

স্বতঃস্ফূর্তি

কান্টের মতে (*Critique of Pure Reason* A50/B74 এবং A51/B75 দ্রষ্টব্য) আমাদের জ্ঞান উৎসারিত হয় মনের দুই মূলাধার থেকে। তার প্রথমটি হলো অনুকীর্তনে সাড়া দেবার ক্ষমতা, আর দ্বিতীয়টি হলো কোনো কিছুকে কেবল অনুকীর্তনের মাধ্যমেই জানার ক্ষমতা (ধারণার স্বতঃস্ফূর্তি)। প্রথমটি সহজ জ্ঞান বা স্বজ্ঞা, আর দ্বিতীয়টি ধারণাভূত জ্ঞান। নিছক ধারণা-রহিত জ্ঞান বা নিছক স্বজ্ঞা-রহিত জ্ঞান থেকে সত্যিকারের জ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে না কিছুতেই। তাদের পারস্পরিকতা জ্ঞানের অপরিহার্য শর্ত।

উভয়বিধ জ্ঞানই বিশুদ্ধ বা প্রায়োগিক হয়। জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়ের উপস্থিতির ফলে যখন তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এসে পড়ে তখন তারা প্রাযোগিক। আর অনুকীর্তনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা মিশ্রিত না হলে তারা বিশুদ্ধ।

অনুকীর্তনে সাড়া দেবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তিকে বলা যায় অনুভব আর শুধু নিজেরই মধ্যে যে অনুকীর্তন, অর্থাৎ ধারণার স্বতঃস্ফূর্তি, তাকে বলা যায় বোধশক্তি। মনুষ্যপ্রকৃতি এমনই যে স্বজ্ঞামাত্রই

অনুভব, কেননা কেবল স্বজ্ঞাতেই আমাদের পক্ষে জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধে যুক্ত হওয়া সম্ভব।

গুরুত্বের বিচারে দুই শক্তিই সমান। অনুভব ব্যতীত কোনো কিছুই আমাদের আয়ত্তে আসে না, বোধশক্তি ব্যতীত কোনো কিছুই চিন্তার গোচর হয় না। 'যে-চিন্তার বিষয় বলে কিছু নেই তা শূন্যগর্ভ, যে-স্বজ্ঞা ধারণা-বিহীন তা অন্ধ।' একটার কাজ অন্যটাকে দিয়ে হবার নয়। 'কেবল উভয়ের সংযোগেই জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর।'

এভাবে দেখতে গেলে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তিকে এক প্রকার জ্ঞান বলে ভাবলে তার স্বাধীনতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যকে আর অবাধ বলে মনে হয় না। কারণ, অনুভবের সহযোগিতা না পেলে তা বেকার। তাই প্রাণে যে-সুর ভরে ওঠে তাও অনুভব-সাপেক্ষ।

অনুভব সেই অবস্থা যখন, পাতঞ্জল যোগদর্শনের তত্ত্ব অনুযায়ী, মন বহির্বিষয় থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ একাগ্রভাবে অন্তর্মুখীন হয়েছে। ('এক বসন্তের গান' প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।) অর্থাৎ তা যখন 'ভরে উঠেছে'। কী করে ভরে উঠলো তা সে হয়তো নিজেই জানে না, তবে স্বতঃস্ফূর্ত ধারণায় এটুকু বোঝে যে একটা গানের ভার সে বহন করছে এবং ফলে তার একাকিত্ব যেন আরো দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

ঐতরিকতা

এর ঠিক আগেই 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা'—হতাশা ছিল অবশ্যই। কিন্তু এখন 'একেলা' শব্দে সেই একাকিত্বের অসহনীয়তা যেন হঠাৎ শেষ দু'লাইনের নৈরাশ্যকে আরো তীব্র করে তোলে। এই

অনুভূতি যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মজিজ্ঞাসার মাশুল সে বিষয়ে সচেতন নয় বলেই হয়তো 'কেমন করে' পদের অসহায়তার সুরে সৃষ্টির আনন্দ চাপা পড়ে গেছে বৃথা এতটা পথচলার অবসাদে। সেই পণ্ডশ্রমটাই যেন বড়ো কথা, আত্মজিজ্ঞাসা নয়। নিজেকে বোঝার সুযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন আমি এখন স্পষ্টতই ঐতরিকতায় আক্রান্ত। কান্টীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায় যে তার অনুভব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার নিজেরই বোধশক্তি থেকে।

নিজের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাই তার একাকিত্ব। কেননা একাকিত্ব অসহ্য হয় তখনই যখন তৃপ্তির অভাবে সঙ্গকামনা নিরতিশয় পীড়িত বোধ করে। যাত্রী আমিটিও এখন একেলা এই অর্থে যে সে নিঃসঙ্গ, পথ চলতে চলতে সে তার অপর-আমিটিকে হারিয়ে ফেলেছে। আশা ছিল গানের ভার বহনে সেই দ্বিতীয় আমির সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু শূন্য মন্দির, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তাই সে একেলা। তার নিজেরই গান সেই নিঃসঙ্গতার ফলে অসহ্য ভারী হয়ে উঠেছে। কবিত্বের ইতিহাসে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঐতরিক সম্বন্ধের সেই নিষ্ঠুর সত্যই গানটির বিষয়।

আবার নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার অনুপাঠে প্রকৃতির সঙ্গে কবিসত্তায় একাত্ম হবার প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলা যায় যে এই নিষ্ঠুর সত্যই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রকৃতিকে নিজের মতন করে নিতে গিয়ে কবির প্রাণে সুর ভরে ওঠে, এবং তারই ভার বহন করে একলা, আশা-নিরাশায়, শূন্য মন্দিরের পথে যাত্রাই কবির আস্তিত্বিক নির্বন্ধ।